POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ
عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسۡلِمِیۡنَ۠

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 29

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 18 July, 2024 11 মহররম 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উপমা

২০৯৩) হযরত আবু মূসা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উপমা হল কস্তুরির (দোকান) এবং কামারের আগুনের ভাটা। যার উপমা কস্তুরীর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে তুমি (দুটির মধ্যে একটি অবশ্যই করবে) হয় তুমি সেটি ক্রয় করবে অথবা তার থেকে সুগন্ধি পাবে। আর কামারের জ্বলন্ত ভাটা হয় তোমার শরীর ও পরিধান পুড়িয়ে ফেলবে অথবা তার থেকে তুমি কেবল দুর্গন্ধ পাবে।

উপহার বিক্রি করা

২১০৪) হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) হযরত উমর (রা.) একটি রেশমের পোশাক বা রেশমের ডোরাকাটা পোশাক উপহার দিলে তিনি সেটি পরিধান করেন। আঁ হযরত (সা.) তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে এটি পরিধান করার উদ্দেশ্যে দিই নি। এটা তো সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যে পরকালের বরকত থেকে বঞ্চিত। আমি আপনাকে এটি একারণে পাঠিয়েছিলাম যাতে এটি থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। অর্থাৎ বিক্রি করে দেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী নীতি

২১৫১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়াকে কেন কাজে লাগাও না? তারা উত্তর দিল,এটা তো মৃত-জীব। তিনি (সা.) বললেন, কেবল সেটি ভক্ষন করা হারাম।

২১২১) ইসমাঈল কায়েস (বিন আবি হাযিম)- এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত জারিরি (রা.) কে বলতে শুনেছি: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এই স্বীকারুক্তি দিয়ে বয়আত করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনও উপাস্য নেই আর মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। আর যত্নসহকারে নামায পড়ব এবং যাকাত দান করব এবং (রসুলুল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ) মান্য করব এবং তাঁর আনুগত্য করব এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী হয়ে থাকব।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

উটের প্রকৃতিতে ইমামের প্রতি আনুগত্য একটি সর্বস্বীকৃত বিষয়।
একটির পিছনে আরেকটি উট পরস্পর বিশেষ ভঙ্গিতে সারিবদ্ধভাবে দ্রুতগতিতে চলে।
অতএব, নেতৃত্বহীন অবস্থায় ইহকালের পথ পাড়ি দিলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

اَفَلَا یَنۡظُرُوۡنَ اِلَی الۡاِبِلِ کَیۡفَ خُلِقَتۡ (আল গাশিয়া: ১৮) এই আয়াতটি নবুয়্যত ও ইমামত সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির সমাধানে অত্যন্ত সহায়ক। আরবী ভাষায় উটের জন্য প্রায় এক হাজার শব্দ আছে যেগুলির মধ্য থেকে এখানে 'ইবল' শব্দটি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে? 'ইলাল জামাল'- এটাও তো হতে পারত!

আসল যে বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে সেটা এই যে, 'জামাল' একটি উটকে বলা হয়, পক্ষান্তরে 'ইবল' শব্দটি বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু এখানে একটি সমষ্টিগত ও সমাজবদ্ধ ব্যবস্থা দেখাতে চেয়েছেন আর 'জামাল' শব্দে সেই অর্থ প্রকাশ পেত না, যা কি না একটি উটের জন্য ব্যবহৃত হয়, এই কারণে তিনি 'ইবল'শব্দটি নির্বাচন করেছেন। উটদের মাঝে একে অপরকে অনুসরণ করার এবং আনুগত্য করার শক্তি দেওয়া হয়েছে। উটদের এক দীর্ঘ সারি হয়ে থাকে আর কিভাবে একটির পিছনে আরেকটি উট পরস্পর বিশেষ ভঙ্গিতে সারিবদ্ধভাবে দ্রুতগতিতে চলে। আর যে উটটি সর্বাগ্রে নেতৃত্ব দেয় সেটা অনেক অভিজ্ঞ ও পথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকে। উটগুলি একে অপরের পিছনে সমান গতি ও ছন্দে এগিয়ে চলে, তাদের কারোর মনেই ঘোড়া ও অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় একসঙ্গে চলার ভাবনা জাগে না। যেন উটের প্রকৃতিতে ইমামের প্রতি আনুগত্য একটি সর্বস্বীকৃত বিষয়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা اَفَلَا یَنۡظُرُوۡنَ اِلَی الۡاِبِلِ বলার মাধ্যমে উটের চলমান সারির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, অনুরূপভাবে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একজন ইমাম বা নেতার প্রয়োজন।

অতঃপর এটাও স্মরণ থাকে যে, এই সারি সফরকালে হয়ে থাকে। অতএব, নেতৃত্বহীন অবস্থায় ইহকালের পথ পাড়ি দিলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এছাড়া উট অনেক বেশি কষ্ট সহনশীল এবং অনেক পথ চলতে সক্ষম। এর থেকে আমরা ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা পাই।

এছাড়াও উটের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘ পথ পাড়ির দেওয়ার সময় তারা বেশ কয়েক দিনের পানি সঞ্চয় করে রাখে। এই কাজটি তারা ভুলে যায় না। তাই মোমেনদেরও সর্বক্ষণ নিজের সফরের জন্য প্রস্তুত ও সতর্ক থাকা উচিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হল তাকওয়া। فَاِنَّ خَیۡرَ الزَّادِ التَّقۡوٰی (আল বাকারা: ১৯৮)

'ইয়ানজুরুনা' শব্দ থেকে জানা যায় যে, এই দেখাটা শিশুদের দেখার মত নয়। বরং এর থেকে আনুগত্যের শিক্ষা পাওয়া যায়। যেভাবে উটদের মাঝে সমন্বয় ও ঐক্যের অবস্থা দেখানো হয়েছে এবং তাদের মাঝে ইমামের আনুগত্যের শক্তি রয়েছে, অনুরূপভাবে মানুষের জন্যও জরুরী হল ইমামের আনুগত্যকে নিজের কর্মপন্থা বানিয়ে নেওয়া। কেননা, মানুষের সেবক উটের মধ্যেও এই বিশেষত্ব রয়েছে। 'ক্যাইফা খুলেকাত' শব্দে সেই সমস্ত উপযোগিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা 'ইবল' এর সমষ্টিগত অবস্থা থেকে পাওয়া যায়। " (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮)

দি কোন ব্যক্তি কেবল মানুষের মাঝে নিজের সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিম্বা কোন প্রথার অনুসরণে কিম্বা হাজী হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে হজ্জে যায় তবে এমন ব্যক্তি নিজের পুর্বের ঈমানও ধ্বংস করে ফিরবে।

অনেকে হজ্জের বাসনা করে, কিন্তু সময়ে তা পূর্ণ করে না আর এইরূপে তারা অনেক বড় পুণ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে সামর্থ্য দান করেছেন তারা বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করার চেষ্টা করুন। কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রেও যতক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়া ও খোদা ভীতিকে দৃষ্টিপটে না রাখা হয় তা কোন উপকারে আসে না। আমি যখন হজ্জ করতে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে সুরাতের এক ব্যবসায়ী যুবককে দেখেছিলাম। সেই যুবক মিনা যাওয়ার সময় যিকরে ইলাহি করার পরিবর্তে উর্দুতে অত্যন্ত রুচি বিবর্জিত প্রেমের কবিতা পাঠ করছিল। দৈবক্রমে ফিরে আসার পথে আমার জাহাজে করেই সে ফিরছিল। একদিন আমি সুযোগ পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বলবেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে হজ্জে এসেছিলেন? আমি তো দেখলাম মিনা যাওয়ার সময়ও আপনি যিকরে ইলাহি করছিলেন না।' সে বলল, আসল কথা হল, আমাদের ওখানে হাজীদের দোকান থেকে লোকে মালপত্র বেশি কেনে। যেখানে আমাদের দোকান আছে তার বিপরীতে আরও একটি দোকান আছে। সে হজ্জ করে যাওয়ার পর নিজের দোকানে বোর্ডে 'হাজী' লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এরফলে আমাদের গ্রাহকগুলোও সেদিকে যেতে শুরু করেছে। এটা দেখে আমার পিতা

(এরপর ৬ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

পুরুষরা নিজেরাই ইকামত বলবে আর এমনিতেও ইকামত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনে ইমাম নিজেও ইকামত বলতে পারে। বাড়িতে নামায হলেও মেয়েরা ইকামত বলবে না। কেননা হুযুর (সা.)-এর অনুমতি প্রদান করেন নি।

প্রশ্ন: ইয়াজুজ ও মাজুজ কারা?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন-

শেষযুগে ইসলাম সম্পর্কে যে সব বিপদাপদ ও নৈরাজ্যের সম্মুখীন হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সেগুলির মধ্যে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ একই ফিতনার দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ। দাজ্জাল হল এই ফিতনার ধর্মীয় রূপটির নাম। যার অর্থ হল এই দলটি শেষ যুগে মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং চিন্তাধারার মাঝে বিকৃতি তৈরী করবে। আর সেই যুগে যে দলটি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি ধ্বংস করবে, সেটিকে ইয়াজুজ মাজুজ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

উভয় দল বলতে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান জাতিসমূহের জাগতিক ও রাজনৈতিক শক্তি এবং তাদের ধর্মীয় দিকটিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই সংবাদও দিয়েছেন যে যখন দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ আত্মপ্রকাশ করবে এবং ইসলাম শক্তিহীন হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রেরণ করবেন। সেই সময় মুসলমানদের কাছে জাগতিক শক্তি থাকবে না, কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহর জামাত দোয়া এবং প্রচারের মাধ্যমে কাজ করে যাবে। যার পরিণামে আল্লাহ তা'লা সেই সব নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবেন।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, হুযুর (সা.) কি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে স্বপ্নে দেখেছিলেন? এর উত্তর হাদীসে পাওয়া যায় যে হুযুর (সা.) আগমণকারী মসীহকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হুযুর (সা.) বলেছেন, রাত্রিতে আমি স্বপ্নে নিজেকে খানা কাবার কাছে দেখতে পাই। সেখানে আমি গোধুম বর্ণের ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যেমনটি তোমরা উৎকৃষ্ট গোধুম বর্ণের মানুষ দেখে থাক, তার থেকেও সুদর্শন। তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়ছিল। তাঁর মাথা থেকে পানিবিন্দু চুঁইয়ে পড়ছিল। সে দুই ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ্র তোয়াফ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ব্যক্তি কে?' লোকেরা বলল, মসীহ ইবনে মরিয়ম। এরপর তার পিছনে আমি আর এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যার কোঁকড়ানো চুল ছিল এবং ডানচক্ষু ছিল দৃষ্টিহীন। এবং ইবনে কুতান (একজন কাফের)=এর সঙ্গে যার অনেক সাদৃশ্য ছিল। সে এক ব্যক্তির দুই কাঁধে ভর করে বায়তুল্লাহ্কে প্রদক্ষিণ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ব্যক্তি কে?' আমি উত্তর পেলাম, 'এ হল মসীহ্-র দাজ্জাল'।

অনুরূপভাবে সহীহ বুখারীর অপর এক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা.) বলেন, (মেরাজের রাত্রিতে) আমি ঈসা (আ.) এবং ইব্রাহিম (আ.)কে দেখেছি। ঈসা ছিলেন লাল রঙের, কোঁকড়ানো চুল এবং প্রশস্ত কাঁধ বিশিষ্ট। আর মুসা ছিলেন গোধুমী বর্ণের, হৃষ্টপুষ্ট সোজা কেশগুচ্ছ সম্পন্ন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি (যুত গোত্রের) সদস্য।

এই দুটি হাদীসে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের কথা বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, হুযুর (সা.) মুসীয় মসীহ হযরত ঈসা (আ.)কেও দেখেছেন, কিন্তু তাঁকে মৃত আম্বিয়া হযরত মুসা এবং এবং হযরত ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখেছেন। এবং নিজের আধ্যাত্মিক পুত্র একনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কেও দেখেছেন, দাজ্জালের যুগে আবির্ভূত হয়ে যাঁর মোকাবেলা করে ইসলামকে রক্ষা করার কথা ছিল এবং তাঁকে তিনি তোয়াফ করতে দেখেছেন।

প্রশ্ন:জার্মানির আমীর সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাজামা'ত নামায পড়ার ক্ষেত্রে নামাযীদের মাঝে দেড় মিটার দুরত্ব বজায় রাখা সম্পর্কে নির্দেশনা কামনা করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পত্রে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযুর বলেন,

মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ,(অর্থাৎ, কর্মের ফলাফল সংকল্পের ওপর নির্ভর করে) অনুযায়ী প্রত্যেক নির্দেশের ভিত্তি সংকল্পের ওপর নির্ভরশীল। অতএব, বাজামা'ত নামায পড়ার জন্য নামাযীদের পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়ানোর এবং নিজেদের মাঝে দুরত্ব না রাখার যে জোরালো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর একটি কারণ বা প্রজ্ঞা হল, তোমরা যদি বাহ্যিকভাবে নিজেদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করো তাহলে শয়তান তোমাদের মাঝে নিজের স্থান করে নিয়ে তোমাদের হৃদয়ে মতভেদ সৃষ্টি করবে।

এখন (করোনার কারণে) যেহেতু অপারগতা রয়েছে। আর সরকার দেশের জনগণের কল্যাণার্থে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তাই আমাদেরকে দেশীয় আইন মেনে এভাবে পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে নামাযে দাঁড়াতে হবে। কাজেই, আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হোক কিংবা শয়তান আমাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করুক- এটি আমাদের অভিপ্রায় নয়। বরং আমাদের অভিপ্রায় হল, আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং সম্মিলিতভাবে এই রোগের মোকাবিলা করি এবং জনগণের কল্যাণার্থে সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করি। কাজেই, এই সংকল্প নিয়ে ব্যাকুল অবস্থায় বাজামা'ত নামাযের ক্ষেত্রে নামাযীদের মাঝে দূরত্ব রাখলে সমস্যার কিছু নেই। আর এ বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়, ভ্রমণের সময় অপারগতাহেতু বাহনের ওপরে বসে নামায পড়ার ক্ষেত্রে। কেননা, সে সময়ও কাঁধের সাথে কাঁধ, হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মেলানো থাকে না আর অনেক সময় নামাযীদের মাঝে পারস্পরিক দূরত্বও থাকে।

কাজেই, সফরের সময় যেভাবে অপারগতা হেতু এমনটি করা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত, তাই এই (করোনা) মহামারিতে অপারগ অবস্থায়ও নামাযীদের মাঝে দূরত্ব রাখলে তাতে দোষের কিছু নেই।

আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন আর শীঘ্রই গোটা বিশ্ব হতে এই কঠিন পরিস্থিতি দূর করে দিন যাতে তাঁর ইবাদতকারী বান্দারা পুনরায় সকল শর্তসহ এবং সুন্দরভাবে নিজেদের ইবাদতের নৈবেদ্য তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে উপস্থাপন করার তৌফিক লাভ করে, আমীন।

প্রশ্ন: বর্তমানকালে অপারগতার কারণে মানুষ যখন বাড়িতে বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা করছে, সেখানে কি মেয়েরা নামাযের জন্য ইকামত দিতে পারে বা ইমাম ভুলে গেলে ভুল ধরিয়ে দিতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি কেবল বাড়ির পুরুষ ও মহিলারা থাকে ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু যদি বাইরের পুরুষ থাকে তবে হুযুর (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে কোনও ভুল হলে মহিলারা হাততালি দিবে। ভুল ধরানোর জন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করবে না বা সুবহানাল্লাহ্ বলবে না।

তিনি আরও বলেন, বাড়িতে নামায হলেও মেয়েরা ইকামত বলবে না। কেননা হুযুর (সা.)-এর অনুমতি প্রদান করেন নি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে যে তিনি যখন কোন অপারগতার কারণে বাড়িতে নামায পড়তেন এবং হযরত আম্মা জান (রা.) কে নামাযে সঙ্গে দাঁড় করাতেন (হযরত আম্মা জান তাঁকে সঙ্গে দাঁড় করানোর অপারগতার কথাও বর্ণনা করেছেন) কিন্তু কোথাও একথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত আম্মা জানকে কখনও ইকামত বলার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, পুরুষরা নিজেরাই ইকামত বলবে আর এমনিতেও ইকামত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনে ইমাম নিজেও ইকামত বলতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর বর্ণনায় যে হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেটি সুনান তিরমিযিতে আমর বিন উসমান বিন ইয়ালি বিন মাররাহ্ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যিনি তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা (ইয়ালি বিন মাররাহ)-র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে সফর করছিলেন। তাঁরা এক সংকীর্ণ স্থানে পৌঁছলেন আর সেখানে নামাযের সময় হল। সেখানে উপর থেকে বৃষ্টি পড়ছিল আর নীচের মাটি কর্দমাক্ত ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজের বাহনে বসে আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। অতঃপর তিনি নিজের বাহনকে সামনে রাখেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে নামায পড়ান। তিনি সিজদায় রুকুর থেকে বেশি ঝুঁকে পড়ছিলেন।

(জামে তিরমিযি, কিতাবুস সালাত, বাব মা জাআ ফিসসালাত)

জুমআর খুতবা

ইতিহাসে সাহাবীদের এমন ঘটনা বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তারা খোদার পথে মৃত্যু বরণ করাকেই নিজেদের জন্য পরম প্রশান্তি মনে করতেন।

বি'রে মউনার অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবী যুবক ছিলেন। পবিত্র কুরআনের কারী হওয়ার কারণে মানুষ তাদেরকে কুরা উপাধিতে স্মরণ করত।

হযরত হারাম (রা.) তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বলেন, "হে বি'রে মউনা বাসীগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো।

"ইসলাম স্বীয় গুণাবলীর কল্যাণে প্রসার লাভ করেছে, বাহুবলে নয়"

আমরবিন তুফায়েল এই আক্রমণের পরও জীবিত ছিল। তার প্রতি রসুলুল্লাহ্ (সা.) অভিশাপ করেন এবং সে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে কুফর এর অবস্থাতেই মারা যায়।

মহানবী (সা.) এ ঘটনাগুলোর কারণে শোকাহত হন, কিন্তু ইসলামে যেহেতু সর্বাবস্থায় ধৈর্যের নির্দেশ রয়েছে, তাই তিনি এ সংবাদ শুনে *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন* পাঠ করেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৪ জুন, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১৪ই এহসান, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু (কথা) উল্লেখ করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, বনু নযীর মদীনার ইহুদীদের একটি পরিবার ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খায়বারের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৬)

মহানবী (সা.) যখন পবিত্র মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর (গোত্রের) নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে আখ্যায়িত হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা.) বনু নযীরের এই নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মুসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই-এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়্যতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও তিনি আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দেবেন বটে, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

অবস্থানের দিক দিয়ে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (বাস) করতো। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি পূর্বে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৭১-১৭২]

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক ভাষ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর ভাষ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে ম'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর এবং তিনি ছাড়া অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি)

বনু নযীর যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মক্কার কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, {তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।} তোমরা আমাদের সঙ্গীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করবো। মক্কার কাফিররা মদীনার নেতাদেরকে এই পত্র লিখেছিল। ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পাওয়ার পর একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে তাদের অর্থাৎ মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে দেয়, আর তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর এই কথা শোনার পর তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আর এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গের(ও) মালিক। হয় তোমরা আমাদের সঙ্গীদের সহযোগীহয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর (গোত্র) মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য একমত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল, যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা চিন্তা করে যে, এমন কোনো দুরভিসন্ধি করা উচিত যাতে মহানবী (সা.)-কে নাউযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার কাছে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের ও আপনাদের মধ্যবর্তী হবে। অর্থাৎ এমন কোনো জায়গা নির্বাচন করুন যেটি উভয়েরই পছন্দের। তারা আপনার কথা শুনবে অর্থাৎ তাদের লোকেরা। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন তিনি (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসেন। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে বের হয়ে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছে। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তখন তারা অর্থাৎ ইহুদীরা তাঁর (সা.)-এর কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি মেনে নেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্খী নারী একজন আনসারী

মুসলমানকে বনু নযীরের এসব চক্রান্তের কথা বলে দেয়; মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য তারা যে ষড়যন্ত্র করেছিল। আর সে মহানবী (সা.) -এর সকাশে উপস্থিত হয়ে ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত করে। (তাই) মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই মদীনায় ফেরত চলে আসেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন লেখক লিখেছেন, বনু নযীর সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও বলেছিল। এটি সে সময়ের কথা যখন কুরাইশরা মুসলমানদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উহুদের কাছে শিবির স্থাপন করেছিল। এই কারণটি শুধুমাত্র মূসা বিন উকবা বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উস্কে দিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৭৫-১৭৬)

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে ম'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদানের একটি বিষয় ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭)

কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারা ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৭২]

এই ঘটনার বিশদ বিবরণ, যেমনটি পূর্বে বি'রে ম'উনার বিশদ বিবরণেও উল্লেখ করা হয়েছিল, তা হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী বি'রে মউনা থেকে মদিনায় ফিরে আসছিলেন। তিনি যখন 'কানাত' নামক স্থানে পৌঁছেন, ('কানাত' স্থানটি মদিনা এবং উহুদের মাঝে মদিনার তিনটি প্রসিদ্ধ উপত্যকার মধ্য থেকে একটি উপত্যকা যেখানে কৃষিকাজ হতো) তখন বনু আমের গোত্রের দুই ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। মহানবী (সা.) তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। হযরত আমর তাদের কাছে তাদের বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেন। তখন তারা উভয়ে নিজ নিজ বংশ পরিচয় জানায়। তারা উভয়ে তার সাথেই অবস্থান করে। এরপর যখন তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী তাদের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাদেরকে হত্যা করেন। এরপর দ্রুত আল্লাহর রসুল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন আর পুরো ঘটনা শুনান। তিনি (সা.) বলেন, তুমি অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছো। আমাদের সাথে তাদের সন্ধি ও শান্তিচুক্তি ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী নিবেদন করেন যে, আমি এই চুক্তি সম্পর্কে জানতাম না। আমি তাদের মুশরিক মনে করতাম, তাদের জাতি আমাদের সাথে প্রতারণা করেছিল। হযরত আমর তাদেরমালপত্র ও কাপড়ও সাথে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের কাছে তার মালপত্র ও কাপড় ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি (সা.) এই জিনিসগুলো তাদের রক্তপণের সাথে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি (সা.) শনিবারে বনু নযীর গোত্রের কাছে যান। মসজিদে কুবাতে নামায আদায় করেন। মুহাজের ও আনসারদের মধ্য হতে কতিপয় সাহাবী তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) যখন বনু নযীর গোত্রে পৌঁছেন তখন তাঁর (সা.) সাথে দশজনেরও কম সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে নিজেদের সভায় বসা অবস্থায় দেখতে পান। তিনি (সা.) বসে পড়েন যেন তাদের সাথে কথা বলতে পারেন যে, তারা যেন সেই দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) -এর সাহায্য করে যাদেরকে হযরত আমর হত্যা করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৮) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৩৯)

এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও লিখেছেন যা থেকে আরও কিছুটা স্পষ্ট হয় যে, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীস ও ইতিহাস বিশারদগণ বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। আর এই মতবিরোধের কারণে এই যুদ্ধের কাল সম্পর্কেও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। ইবনে ইসহাক ও ইবনে সাদ, হযরত মির্যা সাহেব লিখেন যে, যাদের অনুসরণ আমি করেছি, এখানে কোনো বিশেষ গবেষণা ছাড়াই আমি এই অনুসরণ করেছি, বনু নযীর-এর যুদ্ধকে উহুদের যুদ্ধ এবং বি'রে মউনার ঘটনার পরের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর এর কারণ এটি লিখেছেন যে, আমর বিন উমাইয়্যা যামরী, যাকে কাফেররা বি'রে মউনার সময় বন্দি করে মুক্ত করে দিয়েছিল, তিনি যখন মদিনায় ফিরে আসছিলেন, তখন পথে তিনি বনু আমের গোত্রের দুই ব্যক্তিকে পান, যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। আমর যেহেতু এই সন্ধি ও চুক্তি সম্পর্কে জানতেন না তাই তিনি সুযোগ মতো এই উভয় ব্যক্তিকে বি'রে মউনার শহীদদের বিনিময়ে হত্যা করেন, যাদের হত্যার কারণ বনু আমের গোত্রের এক নেতা আমের বিন তোফায়েল ছিল। যদিও বনু আমের গোত্রের লোকেরা এই হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতে জড়িত ছিল না, তারা যুদ্ধ করেনি, কিন্তু যাহোক তিনি এটি ভেবেছিলেন যে, সে প্রতারণা করেছে তাই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, এরা আমাদের শত্রু এবং তাদেরকে হত্যা করেন। আমর বিন উমাইয়্যা মদিনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর কাছে সমস্ত বিষয় তুলে ধরেন। আর উক্ত দুই ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনাও শুনান। তিনি (সা.) যখন এই দুই ব্যক্তির হত্যার বিষয়ে অবগত হন তখন তিনি (সা.) আমর বিন উমাইয়্যার এই কাজে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আর বলেন যে, তারা তো আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। আর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উভয় নিহতের রক্তপণ তাদের উত্তরসূরীদের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যেহেতু বনু আমের গোত্রের লোকেরা বনু নযীর গোত্রেরও মিত্র ছিল আর বনু নযীর গোত্র মুসলমানদের মিত্র ছিল, তাই চুক্তি অনুযায়ী এই রক্তপণের একটি প্রদেয় অংশ বনু নযীর গোত্রের ওপরও বর্তায়, অর্থাৎ কিছু অংশ বনু নযীর প্রদান করবে। কেননা মুসলমানদের সাথে তারা পরস্পর চুক্তিবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ এতে তাদেরও অংশ নেওয়ার ছিল বা কিছু অংশ তাদেরও দেওয়ার ছিল। অতএব তিনি (সা.) এ কারণে নিজের কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে বনু নযীর গোত্রের বসতিতে পৌঁছেন। আর তাদের কাছে এই পুরো ঘটনা তুলে ধরে রক্তপণের অংশ চান যে, এভাবে ভুলবশত হত্যা করা হয়েছে তাই এর রক্তপণ দেয়া উচিত। আমরা নিজেদের অংশ প্রদান করছি। তোমাদের যেহেতু আমাদের সাথে চুক্তি রয়েছে তাই তোমরাও নিজেদের অংশ প্রদান করো।

তিনি লিখেন যে, এটি হলো সেই রেওয়ায়েত অধিকাংশ ইতিহাসবিদ যেটির অনুসরণ করেছে। এমনকি এই রেওয়ায়েতটিই ইতিহাসে সাধারণভাবে প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এর বিপরীতে ইমাম যুহরী-র এই রেওয়ায়েতটি সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পর, কিন্তু এটি বলা যেতে পারে না যে, বিশেষত কোন্ বছর আর কোন্ মাসে মক্কার নেতৃস্থানীয়রা বনু নযীর গোত্রকে এই পত্র লিখেছিল যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, নতুবা আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এতে বনু নযীর গোত্র পরস্পরের সাথে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কোনো চক্রান্ত করে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করা হোক। আর এর জন্য তারা এই প্রস্তাব করে যে, মহানবী (সা.)-কে কোনো অজুহাতে তাদের কাছে ডেকে আনবে আর সেখানে সুযোগ বুঝে তাঁকে (সা.) হত্যা করবে। অতএব তারা তাঁর (সা.) কাছে এই বার্তা পাঠায় যে, আমরা আপনার সাথে আমাদের আলেমদের ধর্মীয় মতবিনিময় করাতে চাই। যদি আমাদের কাছে আপনার সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা আপনার ওপর ঈমান আনয়ন করব। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আপনার যে কোনো ত্রিশজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে আগমন করুন। আমাদের পক্ষ থেকেও ত্রিশজন আলেম থাকবে। আর এরপর পরস্পরের সাথে মতবিনিময় হয়ে যাবে। একদিকে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এই বার্তা প্রেরণ করে আর অপরদিকে উক্ত ষড়যন্ত্রের নীলনকশা প্রণয়ন শেষে সে অনুযায়ী পূর্ণ প্রস্তুতিও নিয়ে নেয় যে, মহানবী (সা.) যখন আগমন করবেন তখন এই ইহুদি আলেমরাই, যাদের কাছে লুকানো ছুরি থাকবে, সুযোগ বুঝে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করবে। কিন্তু বনু নযীর গোত্রের এক মহিলা একজন আনসারকে, যে সম্পর্কের দিক থেকে তার ভাই ছিল, নিজ গোত্রের লোকদের এই ষড়যন্ত্রসম্পর্কে সময়মতো জানিয়ে দেয় আর মহানবী (সা.), যিনি তখন কেবল ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, এই সংবাদ পেয়ে ফিরে আসেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন আর সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে বনু নযীর গোত্রের দুর্গগুলোর দিকে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে পৌঁছতেই তিনি তাদেরকে অবরোধ করেন আর এরপর তাদের নেতৃস্থানীয়দের কাছে এই বার্তা প্রেরণ করেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতির বর্তমানে আমি তোমাদের মদিনায় বসবাস করতে দিতে পারি না, যতক্ষণ না তোমরা নতুনভাবে আমার সাথে চুক্তি করে আমাকে এই নিশ্চয়তা না দিচ্ছো যে, আগামীতে তোমরা চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু ইহুদিরা সন্ধি করতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। আর বনু নযীর গোত্র একান্ত বিদ্রোহাত্মকভাবে দুর্গাবদ্ধ হয়ে বসে যায়। অর্থাৎ একান্ত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন এবং অহংকার দেখিয়ে দুর্গাবদ্ধ হয়ে বসে যায় যে, আমাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে। পরবর্তী দিন তিনি (সা.) এই সংবাদ পান অথবা লক্ষণাবলি দেখে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন যে, ইহুদিদের দ্বিতীয় গোত্র বনু কুরায়যাও কিছুটা অবাধ্য হয়ে উঠছে। অতএব তিনি (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে বনু কুরায়যা গোত্রের দুর্গগুলোর দিকে রওয়ানা হন আর তাদেরকে অবরোধ করেন। বনু কুরায়যা যখন দেখলো যে, গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে গেছে, তখন তারা ভয় পেয়ে যায় আর ক্ষমা প্রার্থনা করে নতুনভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পারস্পারিক সহায়তার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। যার ফলে তিনি (সা.) তাদের অবরোধ তুলে

নেন। আর পুনরায় বনু নযীর গোত্রের দুর্গগুলোর দিকে ফিরে আসেন। কিন্তু বনু নযীর রীতিমতো নিজেদের হঠকারিতা এবং শত্রুতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে আর পূর্ণ যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়।

এগুলো হলো সেই দুটি ভিন্ন রেওয়ায়েত যেগুলো বনু নযীরের যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও ঐতিহাসিক দিক থেকে দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি অধিক সঠিক আর অন্যান্য হাদীসেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রেওয়ায়েতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু প্রথম রেওয়ায়েতটিকে ইতিহাসবিদরা অধিকহারে গ্রহণ করেছেন আর কতিপয় সহীহ হাদীসেও এর শুদ্ধতার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাই ইমাম বুখারী যোহরীর ভাষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও আমের গোত্রের দুজন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ প্রদানের উল্লেখ করেছেন। তাই আমাদের মতে উভয় রেওয়ায়েতকে যদি সঠিক ধরে নিয়ে একত্রে মিলানো হয়- তাতে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। তবে যুদ্ধের যুগ সম্পর্কিত দুটি বর্ণনার মধ্য থেকে একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতেই হবে, কেননা যুগের দিক থেকে দুটি রেওয়ায়েতকেই সঠিক বলা যায় না। সম্ভবত বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় যুদ্ধের বিভিন্ন কারণ সৃষ্টি হয়েছে আর মহানবী (সা.) তাদেরকে অবকাশ দিতে থেকেছেন এবং ক্ষমা করতে থেকেছেন; কিন্তু সর্বশেষ কারণ অর্থাৎ বি'রে মঊনার যে ঘটনা ঘটেছে, এরপর মহানবী (সা.) তাদের সমস্ত অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করেছেন। মোটকথা, যতগুলো ভিন্ন ভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা নিজ নিজ অবস্থানে সঠিক ছিল, কিন্তু বনু আমেরের দুজন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ চাওয়ার সময় যে ঘটনা ঘটেছে- সেটিই ছিল অভিযানের চূড়ান্ত কারণ। বাকি আল্লাহ্ ভালো জানেন। এই সমস্ত বর্ণনা আমি সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (পুস্তক) থেকে নিয়েছি। (সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-৫২২-৫২৫)

এরপর লেখা আছে, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার বনু নযীরের হীন ষড়যন্ত্রও উক্ত অভিযানের কারণসমূহের মাঝে একটি কারণ ছিল। এ বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রক্তপণ বিষয়ক আলোচনার জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দল নিয়ে বনু নযীর গোত্রে যান। মহানবী (সা.) শনিবার বের হন। তিনি (সা.) মুহাজের ও আনসারদের এক জামা'তের সাথে কুবার মসজিদে নামায আদায় করেন এবং চুক্তি অনুযায়ী বনু নযীরের কাছে রক্তপণ দাবি করেন। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৮)

মহানবী (সা.) যেসব সাহাবীদের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা দশ জনেরও কম ছিল। উক্ত রেওয়ায়েতে এটিই লেখা হয়েছে। তাদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর নামও পাওয়া যায়। (কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

মহানবী (সা.) সেখানে পৌঁছে ইহুদিদের কাছে রক্তপণ দাবি করেন। তারা বলে, অবশ্যই হে আবুল কাসেম! আপনি প্র থমে খাবার খেয়ে নিন, এরপর আমরা আপনার বিষয়টি সমাধা করে দিচ্ছি। এভাবে বাহ্যত ইহুদিরা হাস্যবদনে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে,কিন্তু অন্তরালে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। সে সময় মহানবী (সা.) তাদের একটি ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে ছিলেন। ইহুদিরা পরস্পর শলাপরামর্শ করে বলে, মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য তোমরা এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না; তাই বলো, কে আছো, যে গিয়ে এ বাড়ির ছাদে উঠে দেয়ালের ওপর থেকে একটি বড় পাথর তাঁর ওপর ফেলবে, যাতে তাঁর থেকে আমরা মুক্তি লাভ করি। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭)

আরেকজন লেখক উক্ত ঘটনার বর্ণনায় লিখেছেন, তাদের সর্দার হুয়াই বিন আখতাব বলেন, হে ইহুদিদের দল! মুহাম্মদ (সা.) সামান্য কয়েকজন সাথি নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন। তাদের সংখ্যা দশেরও কম। এই ঘরের ওপর থেকে বড় পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করো। তোমরা এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ দ্বিতীয়বার আর পাবে না। যদি তোমরা তাকে হত্যা করতে পারো তাহলে তাঁর সঙ্গী-সাথিরা দলছুট হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আগত তার সাথিরা মক্কায় ফেরত চলে যাবে আর এখানে কেবল অওস এবং খাযরাজ গোত্র থেকে যাবে যারা তোমাদের মিত্র গোত্র। অতএব যা করার- এখনই করো। তখন আমর বিন জাহহাশ নামের এক হতভাগা ইহুদি বলে, আমি এই ঘরের ছাদে গিয়ে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) হত্যা করব। যখন এইসব ষড়যন্ত্রমূলক শলাপরামর্শ চলছিল, তখন সালাম বিন মিশকাম নামের বনু নাযীরের এক সর্দার বলে ওঠে, হে ইহুদিদের দল! তোমরা সারা জীবন আমার বিরোধিতা করো, কিন্তু আজ আমার কথাটা শোনো। আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের এই হীন ষড়যন্ত্রের কথা মুহাম্মদ (সা.)-কে জানিয়ে দেওয়া হবে। আর এটি করলে আমাদের ও তাদের মাঝে যে চুক্তি আছে, সেই চুক্তি লঙ্ঘন হবে। কিন্তু ইহুদিরা তার কোনো কথা শোনেনি আর নিজেদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৯-৪০)

এর পরবর্তী ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে অর্থাৎ তারা কী করেছিল, কীভাবে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল আর মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে রক্ষা করেছিলেন এবং কীভাবে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিলেন ইত্যাদি।

পরিশেষে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য আমি বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমানে তাদের ওপর পুনরায় কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা যেন দ্রুত পাকিস্তানের আহমদীদেরকে এই সকল জালেমদের হাত থেকে মুক্তি দান করেন আর সেখানে যেন আমাদের অবস্থার উন্নতি হয়। পাকিস্তানে সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে (আহমদীদের বিরুদ্ধে) মামলা দায়ের করা হয় এবং (আহমদীদেরকে) বিপদে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

জুমুআর নামাযের পর আমি জানাযার নামাযও পড়াবো। প্রথমে তাদের কিছুটা স্মৃতিচারণ করতে চাই।

প্রথম স্মৃতিচারণ শহীদ মোকররম গোলাম সারোয়ার সাহেবের। তিনি ছিলেন মোকাররম বশীর আহমদ সাহেবের পুত্র। অপরজন হলেন শহীদ রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব, যিনি ছিলেন মোকাররম মুশতাক আহমদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র। উভয়ে সাদুল্লাহ্পুর, মনডী বাহাউদ্দিন জেলার অধিবাসী ছিলেন। গত ০৮জুন তাদের উভয়কে শহীদ করা হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

এক আহমদী বিদ্বেষী একের পর এক গুলি করে গোলাম সারোয়ার সাহেব এবং রাহাত বাজওয়া সাহেবকে শহীদ করে। শাহাদাতের সময় শহীদ গোলাম সারোয়ার সাহেবের বয়স ছিল ৬৪ বছর আর শহীদ রাহাত বাজওয়া সাহেবের বয়স হয়েছিল ৩২ বছর। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, শহীদ গোলাম সারোয়ার সাহেব সাদু ল্লাহ্পুর আহমদীয়া মসজিদ থেকে যোহরের নামায আদায় করে নিজ বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির নিকটবর্তী স্থানে আহমদীয়াতের ঘোর শত্রু নিকটস্থ মাদ্রাসার এক ছাত্র, সৈয়দ আলী রেজা জনাব গোলাম সারোয়ার সাহেবের পিছু নেয় এবং পিস্তল দিয়ে গুলি করে। মাথায় গুলি লাগার কারণে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের পরপরই ঘাতক ঘটনাস্থল ত্যাগ করে এবং গ্রামের অন্য প্রান্তে গিয়ে অপর একজন আহমদী জনাব রাহত আহমদ বাজওয়া সাহেবকেও গুলি করে শহীদ করে। পরবর্তীতে ঘাতককে গ্রেফতারও করা হয়। ঘটনার পর অপরাধী পুলিশকে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে, হ্যাঁ, আমিই তাদের উভয়কে হত্যা করেছি। [সে নাকি জান্ন াতের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য এরূপ অপকর্ম করেছে।] সে বলেছে, আমি জান্নাত লাভের আশায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছি, যদি তখন আমি অন্য কোনো আহমদীকে পেতাম, তবে তার প্রাণ হরণ করতেও দ্বিধা করতাম না।

এই হলো মৌলভীদের শেখানো ইসলামের প্রভাব। তারা নাকি মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছে। তারা আসলে ইসলামের দুর্নাম করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দ্রুত পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন।

জনাব বশীর আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ গোলাম সারোয়ার সাহেবের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় মরহুমের বড় দাদা হযরত শারফ দীন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে যিনি প্লেগের নিদর্শনে প্রভাবিত হয়ে সাদু ল্লাহ্পুরের অন্যান্য আহমদীদের সাথে হযরত মওলানা গোলাম রসুল রাযেকী (রা.)-এর মাধ্যমে পত্র মারফত বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ১৯০৩ সালে জেহলামের মামলার কারণে জেহলাম এসেছিলেন, তখন তিনি সেখানে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ করেন। খোদা তা'লার কৃপায় শহীদ মরহুম নেযামে ওসিয়্যতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায বাজামা'ত আদায়কারী ও তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। নফল রোযার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এছাড়া জামা'তের বইপুস্ত ক নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন এবং জামা'তের জন্য নিয়মিত দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন। দৈনিক ভিত্তিতে সদকা আদায় করতেন। গোপনে অভাবীদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কখনো কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে রিক্তহস্তে বাড়ি থেকে বিদায় দিতেন না। স্থানীয় জামা'তে জেনারেল সেক্রেটারী ছাড়া সাদু ল্লাহ্পুর-এর মুরব্বী আতফাল হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুমের তবলীগ করার প্রতি ভীষণ আগ্রহ ছিল। তার মাধ্যমে কিছু পুণ্যবান ব্যক্তি বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। অতীতে কলেমা অভিযানের সময় অন্যান্যদের সাথে তিনিও তিন-চারদিনের জন্য কোনো মামলা ছাড়াই কারাবরণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

জেলা কায়েদ এবং মরহুমের ভাতিজা শাহেদ ইমরান বলেন, শহীদ বার বার এই ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন কাজ করার সৌভাগ্য দিন যার ফলশ্রুতিতে আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা তার এই আকাঙ্ক্ষা

এভাবে পূর্ণ করেছেন। উত্তরসূরিদের মাঝে স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সাজেদা পারভীন ছাড়া দুই পুত্র ও চার কন্যা অন্ত র্ভুক্ত। তার দুজন কন্যা ছোটো রয়েছে যাদের একজন এফএসসি-তে পড়ালেখা করছে এবং আরেকজন মেট্রিকে। অন্যান্য সব সন্তান বিবাহিত। বলা হয়, তার মাঝে আনুগত্যের অসীম প্রেরণা বিদ্যমান ছিল। জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, মরহুমের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এবং কখনো কখনো তার সাথে মনোমালিন্য হয়ে যেত। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এমনটি হয়ে থাকে, কখনো বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ে যেত কিন্তু জামা'তী বিষয় যখন সামনে আসত তখন তিনি বলতেন, আপনি জামা'তের প্রে সিডেন্ট। আপনি যা-ই বলবেন আমি তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করব। তিনি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের কারণে জামা'তের কাছে অনেক অভিযোগ এসে থাকে যে, তারা জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করছে না, কিন্তু তিনি কখনো এটি প্রকাশ হতে দেননি। পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে ব্যবস্থ াপনার প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করেন।

রিজিওনাল মুরব্বী মালেক আমানু ল্লাহ্ সাহেব বলেন, গোলাম সারওয়ার সাহেব সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তিনি মসজিদে সর্বপ্রথম এসে প্রথম সারির ডানদিকে বসে যেতেন। যিকরে ইলাহীতে মগ্ন থাকতেন। অত্যন্ত বিনয়ী এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠের আগ্রহ ছিল এবং তবলীগের প্রতিও ভীষণ ঝোঁক ছিল বিধায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর 'মজলিসে ইরফান' ও অন্যান্য অডিও-ভিডিও নিজের সংগ্রহে রাখতেন আর সেগুলো অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনতেন ও দেখতেন। একজন মুরব্বী লেখেন, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম- মসজিদে আক্রমণ হয়েছে এবং আমি শহীদ হয়ে গিয়েছি অর্থাৎ মুরব্বী সাহেব। মুরব্বী সাহেব যখন এই স্বপ্নের কথা তাকে শোনান তখন শহীদ মরহুম বলেন, মুরব্বী সাহেব! দেখা যাক প্রথমে আপনি শহীদ হন নাকি আমি। মনে হয় তিনি পূর্বে কোনো ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন, যে-কারণে একথা বলেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার প্রজন্মের মাঝেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখুন আর পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাদেরকে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো শহীদ শ্রদ্ধেয় রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেবের , যিনি মুশতাক আহমদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র ছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী রাহাত বাজওয়া সাহেব সাদু ল্লাহ্পুর বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত তার 'পাকওয়ান সেন্টার' [খাবারের দোকানের নাম- অনুবাদক] থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। ইত্যবসরে হন্তারক সৈয়দ আলী রেযা তাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে। মাথায় গুলি লাগার কারণে তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান। রাহাত আহমদ বাজওয়া শহীদ সাহেবের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা রশীদ আহমদ সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল যিনি তার ভাই হাফিয উল্লাহ্ সাহেবের মাধ্যমে ১৯৭৮ সালে বয়আত করেছিলেন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় শহীদ মরহুম নেযামে ওসীয়্যতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখনই কোনো আহমদীর শাহাদাতের খবর পেতেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে বলতেন, এই মর্যাদা তো কেবল সৌভাগ্যবানরাই লাভ করে থাকে। খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। আতিথেয়তার গুণ দেখার মতো ছিল। অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি ছিলেন। সবার সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। কেউ নেতিবাচক কথা বললে এর বিপরীতে তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতেন। ২০১৮ সালে কাদিয়ান গিয়েছিলেন।সেখানে বেশিরভাগ সময় মসজিদে অথবা বাইতুদ দোয়াতে দোয়ায় মগ্ন থাকতেন। যখনই জামা'তের সেবার জন্য ডাকা হতো তৎক্ষণাৎ সব কাজ ছেড়ে উপস্থিত হয়ে যেতেন। জামা'তের অনুষ্ঠানে মেহমানদের জন্য নিজে খাবার তৈরি করতেন, কেননা তার নিজের খাবারের দোকান ছিল। তার ইচ্ছা ছিল জীবন উৎসর্গ করে দারুয যিয়াফতের অধীনে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করবেন। তার এক চাচাতো ভাই জামেয়াতে পড়ছেন। তিনি বলেন, আমার সাথে যখনই দেখা হতো সবসময় এই বলে উপদেশ দিতেন যে, কখনো অবিশ্বস্ততার পরিচয় দেবে না আর শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করবে- তবেই তুমি আমাদের বংশের জন্য সম্মানের কারণ হবে।

শহীদ মরহুম উত্তরসূরি হিসেবে পিতামাতা ব্যতীত তার স্ত্রী আমাতুন নূর সাহেবা এবং দুই কন্যা- চার বছরের স্নেহের জুবাইরিয়া এবং দেড় বছরের জুমাল রাহাত-কে রেখে গেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা এই শহীদদের জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চস্থান দান করুন, অনুগ্রহ ও ক্ষমার আচরণ করুন, শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে উত্তম ধৈর্যধারণের তৌফিক দিন এবং তাদেরকে নিজ নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন।

এর সাথে আরেকটি জানাযা রয়েছে মোকাররম মালেক মুজাফফর খান জুইয়া সাহেবের যিনি গত কিছুদিন পূর্বে ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার ছেলে মুহাম্মদ মুতিউল্লাহ্ জুইয়া সাহেব একজন মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি বর্তমানে হাওয়াইতে রয়েছেন আর ভ্রমণের কাগজপত্র না হবার কারণে পিতার জানাযা ও দাফনকাজে অংশ নিতে পারেননি। মুরব্বী সাহেব লিখেন, আমার পিতা অত্যন্ত ধার্মিক, তাকওয়াশীল, দানশীল, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, নিয়মিত নামাযী, নিয়মিত অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াতকারী একজন পবিত্র ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। ২৪ বছর বয়সে ১৯৫৩ সালে তিনি নিজে নিজেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করায় তার মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। অ ার তখন থেকেই তিনি আল্লাহ্ র ইবাদত, খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা এবং মানবতার সেবায় আদর্শিক জীবনযাপন করেছেন। তার সারাজীবনে বিভিন্ন পদে জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। ১৫ বছর পর্যন্ত নিজ জামা'ত ১৫২ উত্তর চক জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বলেন, তার মুখে আমি কখনো কোনো জামা'তের কর্মকর্তা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ শুনিনি। সর্বদা উপদেশ দিয়ে বলতেন, কোনো জামা'তী কর্ম কর্তা- তা তিনি সায়েক-ই হোন না কেন, যদি তোমার ঘরে আসে তাহলে খলীফার প্রতিনিধি হিসাবে তার সম্মান করা তোমার জন্য আবশ্যক। তিনি নিজেও সর্বদা জামা'তী মেহমানদের ও কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে সম্মান করতেন। আমি যখন ২০০৫ সালে ওসিয়্যতের তাহরীক করি, তিনি তার আগেই ওসিয়্যত করেছিলেন। তিনি তখন তার ওসিয়্যতের হার এক-দশমাংশ থেকে বাড়িয়ে এক-তৃতীয়াংশ করেন। তিনি একথা ভেবে হার বাড়িয়ে দেন যে, এই তাহরীকে আমি কীভাবে লাব্বায়েক বলব! সকল সন্তানকে বলতেন, আর্থিক কুরবানী এবং চাঁদা প্র কৃতপক্ষে সেটাই হয় যা মানুষপ্রথমেই আদায় করে এবং সেক্রেটারী মাল-কে যেন স্মরণ করানোর সুযোগই দেওয়া না হয়। তিনি নিজেও তার মাসিক পেনশন যা পেতেন তা থেকে সর্বপ্র থম চাঁদা আদায় করতেন। তিনি বলেন, ১৯৯০ সালের মাঝামাঝিতে আমাদের জামা'তে মুরব্বী কোয়ার্টার নির্মাণ করার প্রয়োজন হয় তখন তিনি নিজের জমি যা মসজিদের পাশে এবং গ্রামের মধ্যেই ছিল- তা নির্দ্বিধায় দান করে দেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমার আচরণ করুন এবং উচ্চমর্যাদায় সমাসীন করুন। তার সন্ত ানদের তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন, আমীন।

****

আমাকে বললেন, তুমিও হজ্জ করে এস, যাতে ফিরে এসে তুমি হাজী লেখা বোর্ড দোকানে ঝোলাতে পার। এখন বল তো, এমন হজ্জে সেই যুবকের কোন পুণ্য লাভ হবে? পুণ্য তো দূরে থাক, নিঃসন্দেহে এমন হজ্জ তার জন্য পাপের কারণ হবে। তাই মানুষকে সব সময় কাজের মাঝে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। অন্যথায় সেই একই পুণ্য ধ্বংস ও শাস্তির কারণ হবে। নিঃসন্দেহে হজ্জ অনেক বড় পুণ্য, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল মানুষের মাঝে নিজের সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিম্বা কোন প্রথার অনুসরণে কিম্বা হাজী হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে হজ্জে যায় তবে এমন ব্যক্তি নিজের পূর্বের ঈমানও ধ্বংস করে ফিরবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটা ঘটনা শোনাতেন যে, একবার শীতকালে এক রেলস্টেশনে এক অন্ধ বৃদ্ধা গাড়ির অপেক্ষায় বসে ছিল। তার কাছে আর কোন কাপড়ও ছিল না, কেবল একটা চাদর ছাড়া যেটা সে গাড়িতে বসার পর দ্রুত বাতাসের কারণে শীত অনুভত হলে গায়ে দিবে বলে সামলে রেখেছিল। চাদরটি সে যত্ন করে রেখেছিল আর কিছুক্ষণ পর পর সে চাদরটি হাঁতড়ে দেখছিল। এক ব্যক্তি তার কাছ দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার সময় চিন্তা করল, এ তো অন্ধ, তাছাড়া এখন তো অন্ধকারও হয়ে এসেছে। তাই আমি যদি তার চাদরখানি তুলে নিই, তবে সেও জানতে পারবে না আর আশপাশের লোকেরাও জানতে পারবে না। এই ভেবে সে চুপিসারে চাদরটি হাতিয়ে নেয়। সেই বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে উঠল-'ও হাজী ভাই আমার চাদরটি দিয়ে দাও। আমি অন্ধ ও হতদরিদ্র বৃদ্ধা, আমার কাছে আর কোন কাপড় নেই।' সেই ব্যক্তি কালবিলম্ব না করেই ফিরে এসে চুপিসারেই চাদরটি তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,মা তুমি কেবল এতটুকু বলে দাও যে, আমি হাজী সেকথা তুমি কিভাবে জানলে? ' বৃদ্ধা বলল, 'খোকা,এমন কাজ হাজী ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। আমি অন্ধ, দুর্বল ও হতদরিদ্র, শীতকাল আর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গা, এমন পরিস্থিতিতে জাত চোরও আমার একমাত্র কাপড়টি চুরি করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। এমন কাজ হাজীরাই করতে পারে।

বস্তুত হজ্জ কেবল তখনই কল্যাণকর হতে পারে যখন মানুষের হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে আর নিষ্ঠা ও ভালবাসা সহকারে এই ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে। সে নিষ্ঠা নিয়ে হজ্জে গেলে ঈমানের ভাণ্ডার নিয়ে ফিরে আসবে আর যদি নিষ্ঠাহীন অবস্থায় যায় তবে পূর্বের ঈমানও হাতছাড়া হবে।

(তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্পেন সফর, ২০১৩ (মার্চ, এপ্রিল))

কুইজ

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও স্কীমের সূচনা কবে হয়?

উত্তর: ৩রা এপ্রিল ১৯৮৭ সালে।

প্রশ্ন: কোন খলীফা ওয়াকফে নও স্কীম প্রবর্তন করেছিলেন?

উত্তর: হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)

প্রশ্ন: প্রাথমিক পর্যায়ে কত সময়ের জন্য এটা শুরু হয়?

উত্তর: দুই বছরের জন্য।

প্রশ্ন: এরপর এই স্কীমের মেয়াদ কত বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়?

উত্তর: আরও দুই বছরের জন্য।

প্রশ্ন: কোন বছর ওয়াকফে নও স্কীমকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়?

উত্তর: ১৯৯১ সালে।

প্রশ্ন: হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) এ বছর কবে ওয়াকফে নওদের বিষয়ে খুতবা প্রদান করেছেন?

উত্তর: ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৩।

প্রশ্ন: এই খুতবায় হুযুর আনোয়ার কোন মায়েদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন?

উত্তর: আহমদী মায়েদের।

প্রশ্ন: উক্ত খুতবায় হুযুর কোন বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদেরকে নিজেদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন?

উত্তর: ১২-১৩ বছরের শিশুদের।

প্রশ্ন: উক্ত খুতবায় হুযুর কোন সূরার আয়াত তিলাওয়াত করেন?

উত্তর: সূরা আলে ইমরান, সূরা তওবা এবং সূরা সফ্‌ফাত।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার পিতামাতার নিজেদের অঙ্গীকারে অবিচল থাকা ওয়াকফীনে নও শিশুদের কি নামে অভিহিত করেছেন?

উত্তর: উম্মতে মহম্মাদীয়ার বিশ্বস্ত লোক এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতের প্রকৃত অনুসারী।

প্রশ্ন: উক্ত খুতবায় হুযুর আনোয়ার পৃথিবীকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে কোন কোন জ্ঞান অর্জন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে?

উত্তর: দ্বীন(ধর্ম) ও কুরআনের জ্ঞান।

প্রশ্ন:হুযুর আনোয়ার (আই.) ওয়াকফীনে নও শিশুদেরকে কুরআন মজীদ এবং হাদীস ছাড়া কোন কোন পুস্তক পাঠ করার উপদেশ দান করেছেন?

উত্তর:হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার (আই.) পিতামাতার উপকারের কথা উল্লেখ করে ওয়াকফীনে নও শিশুদেরকে কোন দোয়া করার উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর: আল্লাহ্ তাদের প্রতি কৃপা করুন।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার ওয়াকফীনে নও শিশুদেরকে কঠিন পরিস্থিতিতেও কোন অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং সেটিকে অক্ষুন্ন রাখার উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর: (ওয়াকফে নওদের বিষয়ে) পিতামাতার অঙ্গীকার।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার (আই.) ওয়াকফীনে নও শিশুদের মাঝে আত্মত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য কোন নবীর আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন?

উত্তর: হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কথা।

ওয়াকফাতে নও বালিকাদের ক্লাসের প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: আমরা যদি ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত না হই, তবে সেক্ষেত্রে কিভাবে জামাতের সেবা করতে পারি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ওয়াকফ না হলেও এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো লাজানারা করতে পারে। পার্থক্য এটুকুই যে, যারা ওয়াকফ তাদের জন্যই হয়েছে জামাতের সেবা করার জন্য। কিন্তু অন্যান্য অনেক মেয়েও জামাতের ভরপুর কাজ সেবা করছে যারা ওয়াকফ নয়। অনেক ডাক্তার, শিক্ষক আছেন যারা জামাতের বিভিন্ন বই-পুস্তকের অনুবাদের কাজ করছেন। নতুন প্রজন্মকে বেশি সক্রিয় হওয়া দরকার।

প্রশ্ন: নামাযের মাঝে অন্যান্য চিন্তার কারণে একাগ্রতা নষ্ট হলে এর প্রতিকার কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সব থেকে ভাল প্রতিকার হল 'ইসতেগফার' করা। ইসতেগফার করে পুনরায় নামাযে মনোযোগ তৈরীর চেষ্টা করুন। বিচলিত হওয়ার দরকার নেই, অনেক সময় বড়দেরও চিন্তার কারণে একাগ্রতা নষ্ট হয়। আমার মনে নয় বান্ধবীদের বিষয়ে চিন্তা করেন, ঠিক বলছি তো?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আপনাদেরকে একজন ইমামের গল্প শোনাচ্ছি, যে কিনা নামায পড়াচ্ছিল। ইমামের পিছনে এক বয়স্ক ব্যক্তিও নামায পড়ছিল। ইমাম নামাযের মধ্যেই নিজের ব্যবসা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে। কোথায় যাবে, কিভাবে ব্যবসার উন্নতি করবে এই সব নিয়ে চিন্তা করছিল। সে চিন্তা করল কোলকাতায় সে ব্যবসার প্রসার করবে। পরক্ষণেই তার চিন্তা মক্কার দিকে পরিবর্তিত হয়। তারপর চিন্তা করল রাশিয়াতেও ব্যবসার ভাল সুযোগ আছে। পিছনে থাকা বয়স্ক ব্যক্তিটি খোদার পক্ষ থেকে দিব্যদর্শনের মাধ্যমে ইমামের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। এই কারণে সে ইমামের পিছনে নামায ছেড়ে নিজে একা নামায পড়তে শুরু করে। এতে ইমাম অত্যন্ত রুষ্ট হয় এবং তার কাছে পৃথক ভাবে নামায পড়ার কারণ জানতে চায় এবং বলে তুমি এমনটি করে পাপ করেছ। সেই বুজুর্গ উত্তর দিল, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনার সঙ্গে মক্কা পর্যন্ত তো যেতে পারতাম, কিন্তু আমি অনেক বয়স্ক, তাই রাশিয়া যেতে পারি নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাই বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেবল ইসতেগফার পাঠ করুন এবং বার বার চেষ্টা করুন নামাযে মনোযোগ ও একাগ্রতা তৈরী করার। ইনশাআল্লাহ্ তৈরী হয়ে যাবে।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন, নামায কায়েম করার আরও একটি অর্থ হল, মনোযোগ ভঙ্গ হলে ইসতেগফার পড়ে পুনরায় নামাযে একাগ্রতা নিয়ে আসলে পর্যায়ক্রমে মনোযোগ তৈরী করার অভ্যাস তৈরী হয়ে যায়। ছোট বড় সকলেরই চিন্তা আসে। কোন ব্যপার না। এর জন্য চিন্তার মধ্যে গা ভাসিয়ে না দিয়ে ইসতেগফার পাঠ করে নামাযে ফিরে এস।

প্রশ্ন: মুরুব্বী কথার অর্থ কি আর তারা কিভাবে আমাদের পথপ্রদর্শন করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মুরুব্বী ও মুবাল্লিগের মাঝে সামান্য পার্থক্য আছে। মুরুব্বীর প্রধান দায়িত্ব হল তরবীয়ত করা আর মুবাল্লিগের বেশি মনোযোগ থাকে তবলীগের প্রতি। লাজনারাও একপ্রকার মুরুব্বী। কেননা সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষাদীক্ষা দায়িত্ব তাদেরই। আপনারা সন্তানদের ভালভাবে তরবীয়ত করলে আপনারাও ভাল মুরুব্বী হবেন। আপনারা যদি দেখেন, একজন মুরুব্বী সাহেব ঠিকমত নিজের দায়িত্ব পালন করছেন না তবে আপনারা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং নিজেদের কাজ কিভাবে ঠিকমত করা যায় সেটা তাদেরকে বলে দিন।

প্রশ্ন:সফরে কসরে সালাত বা নামায সংক্ষিপ্ত কেন করা হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সুযোগ দিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) এর যুগে সর্বক্ষণ বিপদের আশঙ্কা থাকত। শত্রুরা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারত। তাই আল্লাহ্ তা'লা নামায সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি প্রদান করেন। আর এই কারণে আমরাও সফরে নামায সংক্ষিপ্তকারে পড়ে থাকি। কেননা যে আমরা নিজেদের এলাকায় থাকি না এবং নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এমনটি করে থাকি। হুযুর আনোয়ার বলেন, একবার আঁ হযরত (সা.) সফর থেকে ফিরছিলেন আর দূর থেকে মদিনার ঘরবাড়িগুলিও দৃশ্যমান হচ্ছিল। কিন্তু সেখানেই তিনি যাত্রাবিরতি দিয়ে সংক্ষিপ্ত নামায পড়েন। মদিনায় বাড়ি পোঁছানোর অপেক্ষা করেন নি। মদিনায় সময়মত পোঁছতে পারবেন না, হয়তো এজন্যই পথে নামায পড়েছেন।

প্রশ্ন: মেয়েরা কেন আযান দেয় না?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, কেননা আযান দেওয়া হয় সেব মানুষদের ডাকার জন্য যারা নামাযের ঘর থেকে দূরে থাকে। মেয়েরা যেহেতু ছোট ছোট দলে নামায পড়ে, তাই তাদের আযান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই কারণে পুরুষরাই আযান দেয়, কারণ তাদের উদ্দেশ্য দূরে থাকা মানুষদেরও নামাযের জন্য ডাকা।

প্রশ্ন: মেয়েরা কি তকবীর দিতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, কেন নয়, মেয়েরা যখন নামায পড়ে তখন তকবীর দিতে পারে।

প্রশ্ন: শওয়াল এর রোয কবে রাখা হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: শওয়াল মাস আসে রমযান মাসের পর। তাই শওয়ালের ছয়টি রোযা অবশ্যই রাখা উচিত। ঈদের ঠিক পরের দিন থেকেই রাখা জরুরী নয়, শওয়াল মাসের যে কোন দিন এই রোযা রাখা যেতে পারে। আর রমযান মাসে পরিত্যক্ত রোযাগুলি বছরের অন্য কোন সময়ে রাখা উচিত।

ভেলেনসিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকার দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

আজকের অনুষ্ঠানে মসজিদ বায়তুর রহমান ভেলেনসিয়া উদ্বোধনের সময় একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল।

সাড়ে ছয়টার সময় হুযুর আনোয়ার বায়তুর রহমান মসজিদে আসেন। হুযুরের আগমণের পূর্বেই অনেক স্পেনিশ অতিথি মসজিদ পরিদর্শন করছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) পার্লামেন্ট সদস্য ডি.জোস মারিয়া আলোনসো এর কাছে জানতে চান যে তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের অনুষ্ঠান ব্রাসেলসে এসেছিলেন কি না। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অনুষ্ঠানটি আপনার কেমন লেগেছিল? অতিথি সাংসদ বলেন, আপনি সেখানে শান্তি ও ভালবাসার যে বাণী দিয়েছিলেন তা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

এরপর ১১ পাতায়.....

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

মসজিদ ফতেহ আযীম এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন, শতবর্ষের অধিককাল পূর্বে ডোই-এর ইসলামের প্রতি ঘৃণার মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যুত্তর "চরম উস্কানি ও বৈরিতার মুখে সংযমের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত" ছিল।তাঁর পুরো ভাষণ জুড়ে হুযূর আকদাস সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতার অসাধারণ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মিশন তুলে ধরে হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণের জন্য এমন এক সময়ে এসেছিলেন যখন মুসলমানগণ ইসলামের আধ্যাত্মিক শেকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বাণী তুলে ধরতে গিয়ে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) দাবি করেন যে, মূসায়ী মসীহ্ হযরত ঈসা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ইসলামের শিক্ষা প্রচার করবেন। তাই নবী ঈসার মত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) মানবজাতির জন্য সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন। তার প্রতিটি কথা এবং কর্মের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে সকলের মাঝে সৌহার্দ্য সৃষ্টির এক প্রেরণা লালন করা। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে স্মরণ করিয়েছেন যে, 'ইসলাম' শব্দটির অর্থই 'শান্তি ও নিরাপত্তা'। আর তাঁর আগমনের পর ইসলাম নিজ আধ্যাত্মিক উৎসমূলে প্রত্যাবর্তন করবে এবং একদিন বিশ্বজুড়ে ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।"

হুযূর আকদাস আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগে (মুসলমানগণ) যেসকল যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, তার সবগুলোই ছিল প্রতিরক্ষামূলক; আর কখনও একটি বারের জন্যও মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করা হয় নি; কিংবা কারও ওপর কোনো প্রকারের নিষ্ঠুরতা বা অবিচারও করা হয় নি। বরং (হুযূর আকদাস বলেন) যে যুদ্ধেই তারা অংশ নিয়েছেন, তা ছিল সকল ধরনের অমানবিকতা এবং নির্যাতন বন্ধ করার জন্য।"

এরই আলোকে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিপূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে, হযরত হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এটি একেবারে স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, কোনো ভূমির ওপর বিজয় লাভ করা, কোনো এলাকা দখল করা, কোনো শহরের ওপর বিজয়ী হওয়া বা কোনো জাতিকে নির্মূল করে দেওয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য নয়। আর সেই সকল দেশে যেখানে আমাদের শিক্ষা এবং আমাদের বিশ্বাস বহুল সংখ্যায় মানুষ গ্রহণ করেছে, সেখানেও আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বা পার্থিব প্রভাব বিস্তারের কোনো আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি নি। আমাদের একমাত্র মিশন এবং আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হল, ভালবাসার মাধ্যমে মানবজাতির হৃদয় জয় করা এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করা যেন তারা তাঁর প্রকৃত উপাসনাকারীতে পরিণত হয় এবং একে অপরের অধিকার রক্ষা করে।"

রাজনৈতিক বা জাগতিক কোনো মর্যাদা লাভ করা যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তা সুনিশ্চিতভাবে তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর (আ.) লেখা থেকে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

মসীহ্ মাওউদ (আ) লিখেন:

"কোনো দেশের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার দেশ তো সবার চেয়ে পৃথক। কোনো মুকুটের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার মুকুটতো আমার প্রিয়তম (খোদার) সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"জাগতিক বা পার্থিব ক্ষমতার প্রতি এই যে পরিপূর্ণ বিমুখতা- এটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সূচনালগ্ন থেকেই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা কেবল ইসলামের ভালবাসা ও শান্তির বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব; যেমনটি আমরা গত ১৩০ বছর ধরে করে আসছি। কোনো ব্যক্তি বা কোনো ধর্মের সাথে আমাদের কোনো প্রকারের ক্ষোভ, বিবাদ বা শত্রুতা নেই। যারা খোদা তা'লার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় বা তাঁর ধর্মকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তাদের জন্য আমাদের প্রত্যুত্তর কখনও এটা হবে না যে, আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেব বা কোনো ধরনের সহিংসতার আশ্রয় নিব। বরং এর বিপরীতে আমাদের একমাত্র উত্তর হল, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সামনে পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে নত হব। আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল দোয়া, আর আমরা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শুনে থাকেন। বস্তুত আমাদের জামা'তের ১৩৩ বছরের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।" ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের নতুন সম্রাট রাজা চার্লস 'ধর্মের রক্ষক' (Defender of the Faith)-এর পরিবর্তে 'সকল ধর্মের রক্ষক' (Defender of all Faiths) হিসেবে পরিচিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা অতীতে ব্যক্ত করেছেন তার প্রশংসা করেন।

রাজা চার্লস-এর শব্দচয়নের এই পরিবর্তনকে কার্যত 'কল্পনাপ্রবণ চিন্তা'আখ্যায়িত করে এর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে গণমাধ্যমে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদিও ধর্মীয় সৌহার্দ্যকে লালন করার এমন প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ 'বৃথা' অথবা 'কল্পনাপ্রবণ চিন্তা'আখ্যায়িত করতে পারেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সকল ধর্মের সুরক্ষা এবং প্রকৃত অর্থেই ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাঝেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা নিহিত রয়েছে।"বিশ্ব-শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলাম যে গুরুত্ব আরোপ করে সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাজ্জ-এর ৪১-৪২ আয়াতে একটি "অসাধারণ ও কালজয়ী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যা সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।" হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করে বলেন: "পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা করে বলে, যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে অবিচার পরিচালনা করা হচ্ছে তার শক্তিশালী জবাব না দেওয়া হয়, তবে কোনো গির্জা, ইহুদি উপাসনালয়, মন্দির, মসজিদ বা অন্যান্য উপাসনালয় নিরাপদ থাকবে না। সুতরাং পবিত্র কুরআন সেই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা কেবলমাত্র সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুসারী মানুষের পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাই প্রদান করে না, বরং আরও অগ্রসর হয়ে মসজিদে ইবাদতকারী মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করে। এটা সেই ঐশী গ্রন্থ যা সকল ধর্ম, বিশ্বাস এবং মত ও পথের নিরাপত্তা প্রদানকারী ও রক্ষক।"

হুযূর আকদাস আরও অগ্রসর হয়ে যায়ন সিটির বিষয়ে আলোচনা করেন যে, কীভাবে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা জন আলেকজান্ডার ডোই ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন। ইসলাম এবং এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে তার অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) সরাসরি তার উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস বলেন, কোনো কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও মি. ডোই-এর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা কেন ব্যবহার করলেন?

হুযূর আকদাস (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ) একটিবারের জন্যও কোনো প্রকারের সহিংস কিংবা চরমপন্থী প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানান নি। বস্তুত যখন তিনি প্রথমবারের মতো ইসলাম এবং এর প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর বিরুদ্ধে মি. ডোই-এর বিষাক্ত উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হন তখন প্রথমে তিনি তার সাথে সম্মানজনকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে তাকে সংযত হতে এবং মুসলমানদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।"

কিন্তু মি. ডোই মুসলমানদের প্রতি তার তীব্র কটূক্তি জারি রাখেন এবং তাদের নির্মূল করার জন্য (খোদার কাছে) প্রার্থনা করেন।

হুযূর আকদাস মি. ডোই-কে উদ্ধৃত করেন, যেখানে তিনি বলেন:

"আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ইসলাম যেন এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হে ঈশ্বর! আমার প্রার্থনা কবুল কর, হে ঈশ্বর! ইসলামকে ধ্বংস কর।"

হুযূর আকদাস (আই.) বলেন: "তিনি [ডোই] লিখেন যে, যদি মুসলমানগণ খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন না করে, তবে তারা মৃত্যু এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। এরূপ কট্টর ভাষা এবং কটূক্তির প্রত্যুত্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, হাজার হাজার এমনকি লক্ষ-কোটি নিরীহ মানুষের যেন ক্ষতি না হয়, যা মি. ডোই-এর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ হলে সংঘটিত হতো। সুতরাং তিনি মি. ডোই-কে দোয়ার এক লড়াইয়ের দিকে আহ্বান করলেন। তিনি (আ.) বললেন, মৃত্যু এবং ধ্বংসের আহ্বান জানানোর পরিবর্তে, তিনি এবং মি. ডোই যেন নিবেদিত চিত্তে দোয়ায় নিমগ্ন হন এবং খোদা তা'লার কাছে এই প্রার্থনা করেন যে, তাদের দু'জনের মধ্যে যিনি মিথ্যাবাদী, তিনি যেন অপর পক্ষের জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

[এরপর শেষের পাতায়....]

শিক্ষার প্রসার ও মানবসেবা প্রদানের ইসলামী নীতিমালা

৮ই অক্টোবর, ২০১৯ ইউনেস্কোর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

তাশাহুদ, তা'উয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন–

শুধীমণ্ডলী! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই অনুষ্ঠান করার যে সুযোগ ইউনেস্কো প্রশাসন দিয়েছে, সেজন্য প্রথমেই আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। একই সাথে আমাদের সেসব অতিথিবৃন্দকে আনইতরক ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এমন একজনের বক্তৃতা শুনতে এসেছেন, যিনি একজন রাজনীতিবিদও ননড়, রাজনৈতিক নেতাও নন,বিজ্ঞানীও নন, বরং একটি ধর্মীয় সংগঠন আহমদী মুসলিম জামাতের নেতা ও প্রধান।

ইউনেস্কো একটি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য, আমি যা জানি তা হল, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসিনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আইনী শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার এবং সারা বিশ্বে শিক্ষাকে উৎসাহিত করা। ইউনেস্কো প্রেস বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সুরক্ষায় বিশ্বাসী। এর আরেকটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল দারিদ্র বিমোচন, স্থায়ী বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা আর এ বিষয়টিও নিশ্চিত করা যে, মানবজাতি এমন একটি ভবিষ্যত যেন পিছনে রেখে যেতে পারে যা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম কল্যাণমণ্ডিত হবে।

আপনারা এটি জেনে আশ্চর্য হবেন যে, ইসলামী শিক্ষা মুসলমানদেরকে এই একই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করতে বলে,আর মানবজাতির ক্রমাগত উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করে যেতে বলে। এই শিক্ষা পবিত্র কুরআনের সূচনায় প্রথম সুরাতেই বিধৃত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা সারা বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু। এটি ইসলামী বিশ্বাসের কেন্দ্র বিন্দু। তেে মুসলমানদেরকে এ কথাই শেখানো হয়ছে যে, আল্লাহ্ তা'লা শুধু মুসলমানদেরই প্রভু বা জীবিকাদাতা নন, বরং তিনি সমগ্র মানবজাতির প্রভু এবং জীবিকাদাতা। তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং বার বার দয়া প্রদর্শনকারী। জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সবার চাহিদা তিনি পূরণ করেন; বরং পুরো সৃষ্টি জগতের চাহিদাই পূরণ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার একজন মুসলমান, এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, সব মানুষ সমান এবং বিশ্বাসে তারতম্য থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীলতার মূল্যবোধ সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ইসলামের খুব সুন্দর একটি নীতির কথা কুরআন করীমের সূরা বাকারার ৩৯ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে আর তা হল- মুসলমানদের উচিত, আল্লাহ্র পন্থা অবলম্বন করা, আল্লাহ্র নীতি অবলম্বন করা এবং তাঁর গুণাবলীতে রঞ্জীন হওয়া। যেভাবে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র রহমত সর্বব্যাপী এবং তিনি সব মানুষের জীবিকাদাতা আর এমনকি তাদেরও জীবিকাদাতা যারা তাঁকে অস্বীকার করে। তাঁর সম্পর্কে যারা অনবরত অপলাপ করে এবং পৃথিবীতে নিষ্ঠুর কার্যকলাপ পরিচালনা করছে, তাদেরকেও তিনি রিযক দিয়ে থাকেন। ইসলামে শান্তির যে দর্শন আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন, তা পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইহকালে আল্লাহ্ তা'লা সব মানুষের উপর ক্রমাগত দয়া ও রহমতের বারি বর্ষণ করেন। মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ স্বীয় গুণাবলী অনুধাবন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের উচিত সৃষ্টির প্রতি দয়া, মায়া আর ভালবাসা প্রদর্শন করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্ব হল অন্যের চাহিদা পূরণ করা,তা সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন বা যে সংস্কৃতির সাথেই তার সম্পর্ক থাকুক না কেন। আরও বলা হয়েছে যে, সবার প্রতি দয়ার্দ্র এবং সহানুভূতিশীল হও এবং অন্যের আবেগ অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল ও মমতাশীল হও।

এছাড়াও কুরআন বলে, ইসলামে রসুল (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন অসাধারণ এবং অতুলনীয় রহমতের উৎস হিসেবে এবং মানবজাতির প্রতি আশীর্বাদ হিসেবে। ইসলামের ভিত্তি রাখার পর মক্কার অমুসলিমদের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদের উপর নৃশংস ও অমানবিক অত্যাচার এবং নির্যাতন করা হয়েছে,যা তারা ধৈর্যের সাথে এবং সহনশীল মনমানসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন। দীর্ঘ দিনের অত্যাচার এবং অনাচারের পর তারা মদিনায় হিজরত করেন,যেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অভ্যাগত মুসলমান, ইহুদী ও অন্যান্যদের মাঝে একটি শান্তি-চুক্তি করেন। সেই শান্তি-চুক্তির শর্ত অনুসারে সব দল শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের অঙ্গীকার করে। পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং পারস্পরিক সহানুভূতির প্রেরণা এবং সহনশীলতার চেতনায় বসবাসের অঙ্গীকার করে। সেই চুক্তি অনুসারে ইসলামের রসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত সেই শান্তি-চুক্তি বা 'মদীনা-সনদ' মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রপরিচালনার এক অতুলনীয় সংবিধান হিসেবে কাজ করে আর এটি বিভিন্ন দল এবং গোষ্ঠীর মাঝে শান্তি বিষয়টি নিশ্চিত করে।

ইসলামের রসুল (সা.) একটি বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যাতে হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ কারোরই ছিল না। এ বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, আইন ধনী-দরিদ্র, শক্তিশালী ও দুর্বল, সবার জন্যই সমান। সর্বক্ষেত্রে একই আইন কার্যকর হবে এবং সব মানুষকে দেশের আইন অনুসারে সমভাবে দেখা হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবার সম্পদশালী এক নারী কোন একটি অপরাধ করে আর অনেকেই এই প্রস্তাব দেয় যে, যেহেতু সমাজে তার পদমর্যাদা অনেক উঁচু ও মহান,তাই তার দোষ ও ভুল উপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু, স্বীয় শিক্ষার অনুসরণ করতে মহানবী (সা.) তাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করেন আর এটি স্পষ্ট করেন যে,তার মেয়েও যদি এই অপরাধ করত, তাহলে তাকেও আইন অনুসারেই দেখা হত আর কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা স্বজন-প্রীতিপ্রদর্শন করা হত না। এছাড়া ইসলামের রসুল (সা.) খুবই কার্যকর এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার কারণে সেই সমাজ অনেক উন্নতি করে। শিক্ষিত শ্রেণীকে বলা হয়েছিল অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষা দিতে আর এজন্য অনাথ ও সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ সবকিছু করা হয় এজন্য যে,দারিদ্র এবং ক্ষমতাহীন এবং দুর্বল শ্রেণী যেন নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে।

এমন একটা কর-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়,যার ভিত্তিতে সমাজের সম্পদশালী মানুষের উপর কর আরোপ করা হয় আর তাতে যা আসতো,তা সমাজের সুবিধা-বঞ্চিতদের জন্য ব্যবহার করা হত। কুরআনের শিক্ষা অনুসারে ইসলামের রসুল (সা.) ব্যবসা-নীতি বা অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রবর্তন করেন এটি নিশ্চিত করার জন্য, যেন ব্যবসা-বাণিজ্য সততার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। দাসপ্রথা যখন সমাজের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তখন দাসদের সাথে অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করা হত।

এক্ষেত্রে ইসলামের রসুল (সা.) সমাজে এক বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। মনিবদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, দাসদের প্রতি তারা যেন দর্য়াদ্র এবং সম্মাজনক ব্যবহার করে। তাদেরকে স্বাধীন করার নির্দেশও হযরত মুহাম্মদ (সা.) বার বার দেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে একটা গণ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়। শহর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার পরিকল্পনাও প্রণীত হয় আর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং দৈহিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বও মানুষকে বোঝানোহয়। রাস্তা-ঘাট সম্প্রসারিত করা হয়,ডাটাবেজড তথ্য সংগ্রহ এবং সাধারণ মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আদমশুমারি করা হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নেতৃত্বাধীন সরকারের তত্ত্বাধানে ব্যক্তি এবং সমাজের অধিকার নিশ্চিত হওয়ায় মদীনায় অসাধারণ উন্নতি ঘটে। আরবদের মাঝে সর্বপ্রথম এক সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যা অবকাঠামোগত ভাবে সেবা,ঐক্য আর সহনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার অর্থেই এক আদর্শ সমাজব্যবস্থা ছিল। মুসলমানরা সেখানে ইমিগ্রেন্ট বা অভ্যাগত হলেও স্থানীয় সমাজে তারা পুরোপুরি মিশে যায় এবং সমাজের সাফল্য এবং উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

এটি খুবই গভীর এক দুঃখের বিষয় যে, আজকে পৃথিবীতে ইসলামের রসুল (সা.)-এর উপর নির্দয় ও নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়। তাঁর চরিত্র হনন করা হয়, তাঁকে এক যুদ্ধংদেহী নেতা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ সত্যের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

বাস্তব অর্থে ইসলামের রসুল (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সব মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছেন। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানবাধিকারের এক অতুলনীয় ও দুষ্প্রাপ্য সনদ তিনি রেখে গেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি (সা.) বলে গেছেন,মানুষের উচিত, সব ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং অন্যদের বিরূপ সমালোচনা করা থেকে বিরত

থাকা।

একবার এক ইহুদী তাঁর (সা.) কাছে আসে এবং অভিযোগ করে যে,তাঁর এক সাহাবী তার সাথে অসদাচরণ করেছে। ইসলামের রসুল (সা.) সেই সাহাবীকে ডেকে পাঠান এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কী হয়েছে? সেই সাহাবী বলেন, ইহুদী বলছে,হযরত মূসা (আ.) হযরত রসুলুল্লাহ (সা.)এর চেয়ে বড় বা শ্রেষ্ঠ,তাই সেই সাহাবী একটি সহ্য করতে পারেন নি আর এই কারণে তিনি কঠোর যুক্তি দ্বারা সেই ইহুদীর যুক্তি খণ্ডন করেন এবং বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর পদমর্যাদাই বড়।

এটি শুনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার অসন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং বলেন, ইহুদীর সাথে বিতর্ক করা উচিত হয়নি বরং তার ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন এবং বলুন যে, আপনি অন্যায় করেছেন। এই ছিল সেই অতুলনীয় শিক্ষা। আমার দৃষ্টিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা এবং ঐক্যের যে ভিত ছিল, তা আজকের যুগে ‘ভুলে বসা ’ হয়েছে, সেটিকে জলাঞ্জলী দেওয়া হয়েছে আর তা করা হচ্ছে তথাকথিত ‘স্বাধীনতা ও বিনোদন’-এর নামে।

এমনকি বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারাও আজ এই ধরণের তিরস্কার এবং আক্রমণের হাত থেকে নিরাপদ নন। এর ফলে সেই ধর্মের মানুষ যদি মর্ম-যাতনায় ভুগে, সেটিকে ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অপরদিকে কুরআন করীম আমাদেরকে বলে যে, এক মুসলমানের জন্য অন্য ধর্মের প্রতিমার প্রতিও কঠোর ভাষা ব্যবহার অনুচিত; কেননা এর প্রত্যুত্তরে তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে অপলাপ করবে বা করতে পারে আর একারণে সমাজের শান্তি ও ঐক্য বিনষ্ট হবে।

দুর্বল ও দরিদ্রদের অধিকার নিশ্চিত করার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, ইসলামের রসুল (সা.) বিভিন্ন স্কীম এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন জীবনযাপনের মানকে আরও উন্নত করার জন্য আর এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, মানুষের আত্মসম্মানবোধ যেন পদদলিত না হয়। তিনি (সা.) বলেন, সমাজের বেশিরভাব মানুষ যেখানে সম্পদশালী এবং শক্তিশালী লোকদের সম্মান দিয়ে থাকে, সেখানে এমন এক ব্যক্তি, যে নৈতিকতায় সজ্জিত কিন্তু দরিদ্র,সে সম্পদশালীর চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়াদির প্রতিও ইসলামের রসুল (সা.) গভীর মনোযোগ দিয়েছেন এবং এটি নিশ্চিত করেছেন যে,যারা সুবিধা-বঞ্চিত মানুষ, তাদের অধিকার যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুসলমানদেরকে তিনি (সা.) বলেছেন, দরিদ্র এবং অভাবীদেরকে তোমাদের ভোজ-সভায় আমন্ত্রণ জানাবে। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন যে, সম্পদশালীরা যদি কর্মক্ষম মানুষদের অধিকার কুক্ষিগত করে, তবে দুর্বলপক্ষকে তোমরা সাহায্য করবে যেন তারা সুবিচার পায় আর ন্যায় যেন পদদলিত না হয়।

ইসলামের রসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) দাসপ্রথা নির্মূল করার সকল প্রচেষ্টা বা পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সব সময় তাঁর অনুসারীদেরকে দাসমুক্ত করার বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে দাসমুক্ত করা যদি সম্ভব না হয়,তাহলে ন্যুনতম তাদের যা করা উচিত তা হল-তাদেরকে তাই খাওয়ানো এবং পরিধান করানো, যা তারা নিজেরা খায় এবং পরিধান করে।

সচরাচর আরেকটি বিষয় যা উত্থাপিত হয় সেটি হল-নারীর অধিকার সংক্রান্ত। প্রায়শঃ এই অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, ইসলাম মহিলাদের অধিকার খর্ব করে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেয় না। সত্যের সাথে এই কথাটি কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিকার অর্থে ইসলামই প্রথমবার নারী এবং মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে এমন এক সময়ে; যখন নারীরা ছিল বৈষম্যের শিকার বা তাদেরকে হেয় এবং তুচ্ছ জ্ঞান করা হত।

ইসলামের রসুল (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন যে, নারীদেরকে যেন সঠিক শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতি যেন শ্রদ্ধাবোধ থাকে। সত্যিকার অর্থে তিনি এটিই বলেছেন যে, কারো যদি তিনজন কন্যাসন্তান থাকে, তাদেরকে যদি সে সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে থাকে এবং সঠিক পথ-প্রদর্শন করে, তাহলে এমন ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উগ্রপন্থীদের এই দাবী সম্পূর্ণভাবেই ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী যে, সহিংসতা, জিহাদ এবং অমুসলিমদেরকে জবাই করার কাজটি কোন ব্যক্তিকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। ইসলামের রসুল (সা.) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের একটি উপায় হল মেয়েদেরকে সুশিক্ষিত করা এবং তাদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এই শিক্ষার ভিত্তিতে সারা বিশ্বে আহমদী মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে

তারা ডাক্তার হচ্ছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা হচ্ছে এবং প্রকৌশলী হচ্ছে। অন্যান্য বিষয়েও তারা প্রথম সারিতে রয়েছে।

আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করি যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা যেন ছেলেদের মতই সমান সুযোগ পায়। উন্নত বিশ্বে আহমদী মেয়েদের শিক্ষার হাত শতকরা নিরানব্বই জন। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা শিক্ষার পাশাপাশি সর্বপ্রথম নারীদেরকে উত্তরাধিকার দিয়েছে; দিয়েছে তালাক দেওয়ার অধিকার বা খোলা নেওয়ার অধিকার। এছাড়া আরো অনেক মানবাধিকার প্রথমবার ইসলাম-ই মহিলাদেরকে দিয়েছে।

এছাড়া ইসলামের রসুল (সা.) প্রতিবেশীর অধিকারের উপর অনেক জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন যে, [মহানবী (সা.) ভাবতে থাকেন যে] হয়তো প্রতিবেশীকেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দেওয়া হবে। এভাবে ইসলামের রসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবাধিকার নিশ্চিত করেছেন- যাতে জাতি ধর্ম বর্ণ ও সামাজিক পদমর্যাদার উর্দ্ধে থেকে প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার সুনিশ্চিত হয়।

ইসলামের রসুল (সা.) শিক্ষার উপর অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধের (বদরের যুদ্ধের) পর স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। অস্ত্র-শস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা’লার সাহায্যে মুসলমানরা মক্কাবাসীদের সে যুদ্ধে পরাস্ত করে। এরপর শিক্ষিত যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব এই শর্ত হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সর্বপ্রথম দেন যে, তারা সমাজের অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষা ও জ্ঞান দান করবে বা লেখাপড়া শেখাবে। এভাবে বেশ কয়েকশত বছর পূর্বে ইসলামের রসুল (সা.) খুবই সফল এবং আদর্শ এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পুনর্বাসন আর সমাজের যুদ্ধবন্দীদেরকে সমাজের মূল স্রোতের সাথে একাকার করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। প্রায়শঃ এই অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, ইসলাম সহিংস ধর্ম এবং যুদ্ধংদেহী ধর্ম। কিন্তু কুরআনে সেই সম্পর্কে যে সত্যটি উল্লিখিত আছে, তা হল বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সব মানুষের বিবেক এবং বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কুরআন বলে, মুসলমানরা যদি মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা না নিত,তাহলে কোন গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয়, মন্দির বা মঠ এবং মসজিদ বা কোন উপাসনাগা নিরাপদ থাকত না। কেননা, বিরোধীরা সকল প্রকার ধর্মকে নিশ্চিহ্ন এবং নির্মূল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানরা যখনই যুদ্ধ করেছেন,সেই যুদ্ধ ছিল প্রতিরক্ষা-মূলক এবং তারা যুদ্ধ করেছেন দীর্ঘস্থায়ী শান্তির উদ্দেশ্যে ও মানুষের অধিকার প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য।

আজকে যদি এমন কোন মুসলমান থেকে থাকে যারা উগ্রপন্থার অনুসরণ করে বা সহিংসতার আশ্রয় নেয়, তারা এটি এ জন্য করে যে তারা ইসলামের শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়েছে বা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। বিভিন্ন দল এবং ব্যক্তি যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে,তা করে ক্ষমতার জন্য এবং সম্পদশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে বা সম্পদের লোভে। একইভাবে, কোন দেশ যদি অন্যায় এবং উগ্র-নীতির অনুসরণ করে, তাহলে তাদের লক্ষ্য এবং নীতির হচ্ছে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা। ইসলামী শিক্ষার সাথে তাদের আচরণের দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলাম মুসলমানদেরকে আগ্রাসী আচরণ করতে বারণ করে।

ইসলামের রসুল (সা.) এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদা কখনও সহিংসতা এবং যুদ্ধ পছন্দ করেন নি। তাঁরা সব সময় শান্তিকে উৎসাহিত করেছেন আর এ উদ্দেশ্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিছু সমালোচক ইসলামের বিরুদ্ধে আরেকটি আপত্তিও উত্থাপন করে আর তা হল ইসলাম একটি জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-অগ্রগতিতে বিশ্বাসী নয় বা এটিকে উৎসাহিত করে না। এটি পুরানো, অসার আর গতানুগতিক একটি অভিযোগ, যা ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয় আর এটি ভিত্তিহীন একটি অপবাদ। শিক্ষার বিষয়ে স্বয়ং কুরআন করীমই গুরুত্বারোপ করেছে।

কুরআন স্বয়ং একটি দোয়া শিখিয়েছে যে, ‘রাব্বি যিদনী ইলমান’ অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর, আমার

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। এই জ্ঞান যেখানে মুসলমানদের জন্য খুবই সহায়ক, সেখানে এটি সামগ্রিকভাবে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত উপযোগী। সত্যিকার অর্থে কুরআন এবং ইসলামের রসুল (সা.) মধ্য যুগের বহু মুসলমান বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক এবং আবিষ্কারকদের মাঝে জ্ঞানের প্রেরণা জাগিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে একহাজার বছর পিছনে তাকিয়ে দেখলে মুসলমান বিজ্ঞানী এবং আবিষ্কারকগণ জ্ঞানের

বিষয়টিকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা স্পষ্টভাবে সামনে আসে। তারা এমন সব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যা পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্যামেরা সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেছেন ইবনে আল হাইতাম আর তার এই বৈপ্লবিক কাজকেই স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো এবং তাকে আধুনিক অপটিক্স-এর জনক নামে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য বিষয় হল ক্যামেরা শব্দটি আরবী কামারা শব্দ থেকে উদ্ভূত। দ্বাদশ শতাব্দীতে একজন মুসলমান কার্টোগ্রাফার অত্যন্ত বিস্তৃত ও সঠিক বিশ্ব-মানচিত্র প্রণয়ন করেছেন, মধ্যযুগে যা শত শত বছর ধরে পরিব্রাজকরা ব্যবহার করেছে।

এছাড়া চিকিৎসার জগতে অনেক মুসলমান চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী অসাধারণ আবিষ্কারাদি সামনে এনেছেন। অনেক আবিষ্কারের এমনও রয়েছে, যা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। শৈল্য চিকিৎসার অনেক যন্ত্রপাতি মুসলমান চিকিৎসকরা আবিষ্কার করেছেন, যেমন-দশম শতাব্দীতে এটি করেছেন আলজেহরাবী আর সপ্তশত শতাব্দীতে ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে। কথিত আছে, ডাক্তার উইলিয়াম হার্ভে যুগান্তকারী এক গবেষণাকর্মে সামনে এনেছেন, যার সম্পর্ক ছিল হৃদপিন্ডে রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কিত এবং হৃদ-যন্ত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত; কিন্তু পরে আবিষ্কৃত হয়েছে এরও চারশত বছর পূর্বে একজন আরব ডাক্তার, ইবনে নফিস'ই এটি আবিষ্কার করেছেন।

নবম শতাব্দীতে জাবের ইবনে হাইসান রসয়ান বিদ্যার জগতে এক বিপ্লব সাধন করেন। তিনি অনেক মৌলিক সূত্র ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন,যা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। বীজগণিতের যে সূত্র রয়েছে, সেটি প্রথমে এক মুসলমান আবিষ্কার করেন তেমনিভাবে ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলোও। আধুনিক যুগে এলগোরিদাম হচ্ছে কম্পিউটিং প্রযুক্তির ভিত্তি আর এটাও আবিষ্কার করে প্রথমে একজন মুসলমান। মুসলমানদের মেধাসম্পন্ন হওয়ার কথা আজও স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিউইয়র্ক টাইমসে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে যা তাদের সায়েন্স রিপোর্টার ডেনিস অভার বাই লিখেছেন। তাতে বহুবিদ্যজ্ঞ মুসলমান নাসির আল দীন আলতুসির কথাও উল্লেখ রয়েছে। তিনি লেখেন, আলতুসি জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ছেপেছেন আর নীতিশাস্ত্র, গণিত এবং দর্শন তাকে তার যুগের অনেক বড় এক চিন্তাবিদ হিসেবে তুলে ধরেছে। এই প্রবন্ধক আরও লেখেন, মুসলমানরা একটা সমাজ গঠন করেছিল, যা ছিল মধ্যযুগে পৃথিবীর বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল। আরবী ভাষা এবং জ্ঞান সে যুগে ছিল সমার্থক শব্দ। প্রায় পাঁচ শত বছর পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজ করে। এটি এমন একটি বিষয়, যা আধুনিক যুগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে আলোকিত করছে।

তাই সূচনা থেকেই ইসলাম, শিক্ষার উপর অনেক গুরুত্ব দিয়ে আসছে আর মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করে চলেছে।

১৮৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠার পর জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা তাঁর অনুসারীদেরকে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের উপর অনেক জোর দিয়ে আসছেন।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে প্রথম মুসলমান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন একজন আহমদী-প্রফেসর আব্দুস সালাম। তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত এক পদর্থ বিজ্ঞানী, যিনি পদার্থবিদ্যায় ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সারা জীবন আব্দুস সালাম এ কথার উপর জোর দিয়েছেন যে, ইসলাম এবং কুরআন শরীফ তার সাফল্যের পিছনে সব চেয়ে বড় অবদান রেখেছে। বরং সত্যিকার অর্থে তিনি বলতেন যে,কুরআন শরীফে এমন সাতশত পঞ্চাশটি আয়াত আছে, যা বিজ্ঞানের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং যা আমাদেরকে প্রকৃতি এবং এ বিশ্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

এছাড়াও আমাদের জামাতের তৃতীয় খলীফা এমন এক প্রভাত দেখতে চেয়েছেন, যখন বড় বড় বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ সামনে আসবে। এই স্বপ্নের কতা তিনিই ব্যক্ত করেছেন আর শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের জামাতে যারা ভাল ফলাফল করে, তাদের মাঝে স্বর্ণপদক দেওয়ার দেওয়ার রীতি তিনিই প্রচলন করেন। প্রত্যেক বছর শত শত আহমদী ছেলে ও মেয়ের মাঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের জন্য এই স্বর্ণপদক বিতরণ করা হয়। আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, শিক্ষা হল দারিদ্র বিমোচনের এমন একটি মাধ্যম,যার অভাবে বহু দরিদ্র দেশ প্রজন্ম পরাম্পরায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। আমরা এগুলো শিখেছি ইসলামের রসুল (সা.)-এর কাছ থেকে, যিনি মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন যে, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষার উপর জোর দাও আর এতীমদের শিক্ষা দাও। তিনি বলেছেন, আধ্যাত্মিক উন্নতি মানব সেবার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তিনি বলেন, মুসলমান কখনও শুধ ইবাদতের মাধ্যমে বা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা একটি দাবি হল মানব সেবা করা।

কুরআন শরীফের ৯০ নম্বর সূরায় আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বলেছেন, ক্ষুধা এবং দারিদ্র দূরীভূত করার জন্য তোমরা কাজ কর আর এতিমদের চাহিদা পূরণ কর এবং সমাজের দূর্বল এবং দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা কর,যেন তারাও উন্নতি করার সুযোগ পায়। পৃথিবীর সকল অংশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই মহান শিক্ষার উপর সাধ্যানুসারে আমল করে চলেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম ভালবাসা, দয়া-মায়া এবং সহানুভূতির ধর্ম।

আমরা মানবজাতির মাঝে ধর্ম-বর্ণের কোন বিভেদ না করে মানবজাতির সেবা নির্বিশেষে করে থাকি। বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং দারিদ্র কবলিত এলাকায় আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি আর স্বাস্থ্যসেবায় হাসপাতাল এবং ক্লিনিক খুলেছি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে আমরা সুপেয় পানীয়-জল সরবরাহের ব্যবস্থা করি। তার অর্থ হল ছেলে মেয়েরা মাইলের পর মাইল পায়ে হেটেঁ পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে স্কুলে যেতে পারে।

আমরা এমন একটা প্রজেক্ট (আদর্শ গ্রাম নির্মাণ প্রকল্প) গ্রহণ করেছি, যার আওতায় কমিউনিটি হল, পানি সরবরাহ, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন অবকাঠামো এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করছি। এই সব কিছু করা হচ্ছে স্থানীয় লোকদের মাঝে, তা তাদের পটভূমি বা বিশ্বাস যাই হোক না কেন। আমরা আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন পালনার্থেই এ সব কিছু করার প্রেরণা পাই আর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি নিয়েই আমরা দারিদ্র বিমোচনের কাজ করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, এটি পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির ভিত রচনার কারণ হতে পারে। মানুষের জন্য খাদ্য আর পানীয় জল যদি থাকে আর মাথার উপর একটা ছাদ থাকে, সন্তান-সন্ততিতে শিক্ষা দানের জন্য স্কুল থাকে,স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা হয়, কেবল তবেই তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং নৈরাশ্যের ভয়াবহ থাবা থেকে মুক্তি পেতে পারে আর সেই মর্মজ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পারে, যা ধর্মীয় উগ্রতায় পর্যবসিত হয়। এগুলো মৌলিক মানবাধিকার। মানুষকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দারিদ্র থেকে মুক্ত করতে না পারব, নৈরাশ্য থেকে মুক্ত করতে পারব না, পৃথিবীতে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব না।

শেষের দিকে আমি এই আন্তরিক দোয়া করব যে, মানবজাতি যেন লোভ-লিপ্সা থেকে মুক্ত হয় এবং সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ছেড়ে দেয় আর সমাজে যারা সুবিধা-বঞ্চিত এবং সমস্যা কবলিত, তাদের দুঃখ ও কষ্ট দূরীভূত করার চেষ্টা করে। এই কয়েকটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আজকের এই সান্ধ্য-অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য পুনরায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

****

সমস্ত অনুষ্ঠানটাই উৎকৃষ্ট মানের ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) স্পেনের আমীর সাহেবকে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণের স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে দ্রুত প্রকাশিত করার নির্দেশ দেন।

ভ্যালেনসিয়ায় ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর পদে আসীন জোস মানুয়ের গিরোনেস প্রশ্ন বলেন, আপনারা শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন। পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করলে কিম্বা তাঁর সঙ্গে কাজ করলে অন্যান্য মুসলমান ফির্কাগুলির বিরোধিতার ভয় নেই তো?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে আমাদের কাউকে কোন ভয় নেই। মুসলমানেরা পছন্দ করুক বা না করুক, আমরা ভয় করি না। যদি পোপের সঙ্গে মিলে পৃথিবীতে ন্যায়, সুবিচার এবং শান্তি যদি পোপের সঙ্গে মিলে কাজ করে পৃথিবীতে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তবে আমরা এরজন্য প্রস্তুত।

দ্বিতীয় খলীফা (র.) ১৯২৪ সালে ইতালি সফরকালে পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করারও বৈঠক করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পোপ সাক্ষাত করতে অস্বীকার করেন আর অজুহাত দিয়েছিলেন যে, আমার প্রাসাদের মেরামতি চলছে। এক পত্র সাংবাদিক সংবাদে একথা ছেপেছিলেন যে, এই পোপ কোন দিন সাক্ষাত করতে পারবে না, কেননা, তাঁর প্রাসাদে সব সময় মেরামতির কাজ অব্যাহত থাকবে। (ক্রমশ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524
সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516
POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 18 July, 2024 Issue No.29

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হুযূর আকদাস (আই.) আরও বলেন: "প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সহানুভূতির একটি আচরণ এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে প্রশমিত করার এক মাধ্যম। মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে সর্বশক্তি নিয়ে মুখোমুখি সংঘাতের ঝুঁকি এড়িয়ে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এই দাবি করেছিলেন যে, তিনি এবং মি. ডোই-এর উচিৎ হবে দোয়াতে মনোনিবেশ করা এবং বিষয়টিকে খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দেওয়া। সত্য নির্ধারণের জন্য এটি ছিল একটি ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পন্থা।

এমনটি বলা মোটেই বাহুল্য হবে না যে, এটি ছিল প্রবল প্ররোচনা ও বৈরিতার মুখে সংযমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত।"

ডোই-এর কাছে যখন এই চ্যালেঞ্জের সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি তাঁর পূর্বের আচরণ থেকে বিরত হন নি। বরং তার নিজ ঘৃণাপূর্ণ পদ্ধতিতে তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে 'মশা-মাছি'র সাথে তুলনা করেন, যাদের ওপর তিনি পা ফেললে সেগুলো 'পদতলে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করবে'।

হুযূর আকদাস (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তাঁর চ্যালেঞ্জ পুনর্ব্যক্ত করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র এটি ব্যাপক প্রচারণা লাভ করে। সাংবাদিকগণ প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে, মি. ডোই-এর নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে তার সুউচ্চ মর্যাদা, তার ধনসম্পদ ও ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে, ভারতবর্ষের এক সুদূর পল্লীতে আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কেই পিছিয়ে রাখেন; পার্থিব সম্পদ ও ক্ষমতায় মি. ডোই-এর সাথে যার কোনো তুলনাই চলে না। উপরন্ত, শারীরিকভাবেও মি. ডোই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর চেয়ে বয়সে কম এবং তুলনামূলকভাবে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। বস্তুগত সকল ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কখনও বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করেন নি, কখনও এক কদম পিছনে যান নি অথবা এই চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করেন নি।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"পার্থিব ও সকল হিসাব-নিকাশের বিরুদ্ধে, অল্প সময়ের ব্যবধানেই তাঁর সপক্ষে ফলাফল প্রকাশিত হল। একের পর এক, ডোই তার সমর্থনকারী লোকজন, সম্পদ, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমের ভাষায় তিনি এক 'করুণ পরিণতি'র মুখোমুখি হলেন। বস্টন হেরাল্ড পত্রিকার একটি বিখ্যাত শিরোনাম ঘোষণা করল, 'মহান সেই মির্যা গোলাম আহমদ, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্' ('Great is Mirza Ghulam Ahmad, The Messiah')| সংক্ষেপে বলা যায়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কখনও কারও ওপর বলপূর্বক তাঁর মতামত বা মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। আর মি. ডোই বা ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের ঘৃণা-বিদ্বেষের উত্তরও তিনি কখনও বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেওয়ার কথা ভাবেন নি।

আহমদী মুসলমানদের জন্য, এই ঘটনাটি আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতার একটি নিদর্শন। আর তাই, এদিক থেকে আমাদের ইতিহাসে যায়ন সিটির এক বিশেষ তাৎপর্যবহ স্থান রয়েছে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ভাষণের শেষাংশে বলেন:

"আজ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর অনুসারীরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ যে, সত্যিকারের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে আমরা আজ যায়ন শহরে ফাতহে আযীম মসজিদ (মহান বিজয়ের মসজিদ) উদ্বোধন করার সৌভাগ্য লাভ করছি। এর দরজাগুলো এই আলোকিত বাণীর সাথে উন্মোচিত হচ্ছে যে, সকল মানুষের এবং সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার এবং শান্তিপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত এবং সম্মানিত। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য হল, মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে পরিচালিত করা এবং নিশ্চিত করা যে, সকল মানুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যের সাথে এবং প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে মিলেমিশে বসবাস করে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন: "আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি এই প্রার্থনা করি যে, এই মসজিদ যেন, খোদা করুন, সর্বদা শান্তি, সহিষ্ণুতা এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য ভালবাসার এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। আমি দোয়া করি, এটি যেন এমন এক স্থানে পরিণত হয় যেখানে মানুষ বিনীতভাবে তাদের স্রষ্টাকে চেনার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সামনে মাথা নত করতে এবং মানবজাতির অধিকার রক্ষা করতে সমবেত হবে। কেননা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমরা কেবল তখনই সফল এবং সমৃদ্ধশালী হতে পারব যখন আমরা খোদা তা'লার ইবাদতের অধিকার এবং মানবজাতির অধিকার সঠিকভাবে আদায় করব।"

মূল ভাষণের পূর্বে, বেশ কয়েকজন অতিথি মঞ্চে এসে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। যায়নের মেয়র জনাব বিলি ম্যাককিনি বলেন:

"যায়ন সিটিতে ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হিজ হোলিনেস আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ-কে স্বাগত জানাতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত বোধ করছি। আমরা সত্যিই সম্মানিত যে, আপনি আজ এই সন্ধ্যায় যায়নে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য হাজার হাজার মাইল সফর করে এসেছেন। এই সম্প্রদায় (আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়) এমন এক সম্প্রদায় যা ইসলামের নবী মুহাম্মদ-এর অনুসারী, যিনি খ্রিষ্টানদের সাথে এক চুক্তি করেছিলেন, যেখানে তিনি খ্রিষ্টানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাদের গির্জাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য সহযোগিতা করবেন এমনকি সেই গির্জাগুলোকে কোনো প্রকার হুমকির মুখে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবেন। এটি হল সেই বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য যা এখানে যায়ন সিটিতে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ধারণ করে। তাঁর আশিসমণ্ডিত দিকনির্দেশনায়, এই সম্প্রদায় শান্তি, ন্যায়বিচার, সার্বজনীন মানবাধিকার ও মানবতার সেবায় পয়গাম নিয়ে সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষের নিকট পৌঁছেছে।"

হুযূর আকদাসকে শহরের চাবি প্রদান করে, জনাব বিলি ম্যাককিনি বলেন: "যায়ন সিটির জন্য আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অসাধারণ সেবা এবং শহরটির উত্তরোত্তর উন্নতি ও এর নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে আপনাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমরা যায়ন শহরের চাবি হুযূর আকদাসের হাতে তুলে দিচ্ছি।"

পরবর্তীতে হুযূর আকদাস এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন:"আমাকে শহরের চাবি প্রদানের জন্য আমি মেয়রের কাছে কৃতজ্ঞ, আর আমি নিশ্চিত যে, এখন এই শহরের চাবিটি নিরাপদ হাতে রয়েছে।"

ইলিনয় রাজ্য আইনসভার সদস্য, রিপ্রেজেন্টেটিভ জয়েস মেসন বলেন: "হিজ হোলিনেস শান্তির স্বপক্ষে একজন নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর খুতবা, বক্তৃতা, লেখনী ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে ধারাবাহিকভাবে মানবতার সেবা, সার্বজনীন মানবাধিকার এবং শান্তি ও ন্যায়বিচারপূর্ণ এক সমাজের আহমদীয়া মুসলিম মূল্যবোধসমূহ তুলে ধরেছেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বিশ্বজুড়ে আইন প্রণেতা এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে কথা বলেছেন। হিজ হোলিনেস নারী অধিকারের একজন বড় প্রবক্তা। এই সম্প্রদায়ের নারী সদস্যগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র এবং সম্প্রদায়ের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই মসজিদটির নির্মাণ তারই জীবন্ত প্রমাণ। এই মসজিদ নির্মাণের ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক অর্থ আহমদী মুসলমান নারীগণ দান করেছেন। এটি কতইনা অসাধারণ? যায়ন সিটির জন্য এটি সৌভাগ্যের বিষয় যে, এমন একটি শান্তিপ্রিয় এবং সেবামুখী সম্প্রদায় এখানে বসবাসের এবং এত সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা যে, এই মসজিদ যেন আশার এক আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়; কেবল এই শহরের জন্যই নয়, বরং এর আশেপাশের সকল শহরের জন্য।"ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ইলিনয় রাজ্য আইন সভার ৬১তম ডিস্ট্রিক্ট-এর পক্ষ থেকে অনারেবল জয়েস মেসন আনুষ্ঠানিক সম্মাননা পত্র প্রদান করেন।

অনারেবল জয়েস মেসন বলেন: "নতুন মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আমি এই (আহমদীয়া মুসলিম) সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানিয়ে একটি হাউস রেজোলিউশন প্রস্তাব করছি, আর আমি এই আনন্দঘন দিনে এই অসাধারণ সম্প্রদায়ের খুশিতে অংশীদার হতে পেরে কৃতজ্ঞ।"

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir